ঘুমের আগের গল্প

বুদ্ধদেব বসু

[illegible] (আকর) গ্রন্থ

দাশগুপ্ত এণ্ড কোং
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মিমিমণির করকমলে

উপহার

সূচীপত্র

ঘুমের আগের

তরঙ্গিনীকে রয়টারের একটি জীবন্ত যন্ত্র বলতে পারো, মিনিটে-মিনিটে সে খবর উগরোচ্ছে। মনে করো সন্ধেবেলায় এক পেয়ালা চা নিয়ে বসেছি ম্যাট্রিকুলেশনের খাতা দেখতে, হঠাৎ তরঙ্গিনী এসে খবর দিলে, 'বাবা, বাবা, একটা টাম যাচ্ছে।'

আমি বললুম, 'টাম নয়, ট্রাম। বলো তো।'

কিন্তু ততক্ষণে তরঙ্গিনী অদৃশ্য হয়েছে। মাথা নিচু ক'রে আরো গোটা দুই লাল পেন্সিলের দাগ এঁকেছি, এমন সময় সে আবার এসে আমার হাত ধ'রে টানলে। 'বাবা—ও, বাবা—শোনো!'

'কী ব্যাপার?'

'একটা টাম ওদিকে যাচ্ছে, আবার আর-একটা টাম এদিকে আসছে।' ব'লে তরঙ্গিনী খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো।

আমি বললুম, 'বেশ। এখন যাও তো একটু ওদিকে। কাজ করছি।'

এ-অনুরোধের দরকার ছিলো না, কথা শেষ ক'রেই তরঙ্গিনী দে ছুট। ৩½ আর ৪½-এর যোগফল পাতার তলায় লিখে পাতাটি ওল্টাতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে সে আবার এসে উপস্থিত। এবার কী খবর?

'ও বাবা, জটিবুড়ি যাচ্ছে রাস্তা দিয়ে, জটিবুড়ি। জটিবুড়িকে চেনো তুমি?'

স্বীকার করতে হ'লো যে চিনি না।

'আমি চিনি। আমি রো—জ দেখি ওকে। এসো দেখবে ওকে। এসো না।'

আমি বললুম, 'রঙ্গি, লক্ষ্মী তো, আমার এখন কাজ আছে।'

'জটিবুড়ির ম—স্ত লম্বা চুল। জানো, ও পাগল হ'য়ে গেছে! খেতে দিলেও খায় না।'

হাতের খাতাখানা শেষ ক'রে কপালের ঘাম মুছলুম। এই খাতা দেখা এক কাজ! যা সব ভুল লেখো তোমরা।

একমনে ব'সে খান তিনেক খাতা দেখে ফেলেছি, পাশের ঘর থেকে তরঙ্গিনীর উল্লাসধ্বনি মাঝে-মাঝে কানে আসছে। চতুর্থ খাতাখানা টেনে নিয়ে সবে খুলেছি, তরঙ্গিনী একেবারে দাপাতে-দাপাতে আমার গায়ে এসে আছড়ে পড়লো।

'ছাখো তো বাবা—মনা আমাকে জুতো বুরুশ করতে দিচ্ছে না!' রাগে, দুঃখে প্রায় কেঁদে ফেলে আরকি বেচারা।

আমি গম্ভীরভাবে বললুম, 'এই মনা—তুই ওকে জুতো বুরুশ করতে দিচ্ছিস না যে?'

ঘুমের আগের গল্প

এই খাতা দেখা এক কাজ!

মনা নামটা হনুমানের অপভ্রংশ নয়, যদিও হ'লে মানাতো। সে তার চোখ মিটমিট করে নাকি সুরে বললে, 'দেখুন তো বাবু, ও আমাকে কিছুতেই কাজ করতে দিচ্ছে না। কেবল বুরুশ কেড়ে নিচ্ছে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুমিই করবে। মনা, ওর হাতে বুরুশটা দে।'

তরঙ্গিনীর দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুখ ভেংচিয়ে এই দশমবর্ষীয় দুর্দান্ত বালক দিলে দৌড়। আর তরঙ্গিনীও ছুটলো পিছন-পিছন সরবে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রে।

তারপর খানিকক্ষণ হুলুস্থূল। তার বিস্তারিত বর্ণনায় কাজ নেই, কারণ তাহ'লে তোমাদের সন্দেহ হ'তে পারে যে বাইরে থেকে তরঙ্গিনীকে যতটা লক্ষ্মী মেয়ে মনে হয়, আসলে হয়তো তিনি তা নন।

ততক্ষণে আমি পুরো দশখানা খাতা দেখে ফেলেছি, আর তার ফলে আমার চোখ টনটন, মাথা ভোঁ-ভোঁ করছে। অথচ আর মোটে পনেরোদিন সময় হাতে আছে, এদিকে খাতার স্তূপও বাকি। হাতের পেন্সিলটা ভুল কাটতে-কাটতে ভোঁতা হ'য়ে গিয়েছিলো; সেটা ছুরি দিয়ে শানিয়ে নিয়ে আবার খাতা-আক্রমণে উদ্যত হলাম।

হুড়মুড় ক'রে তরঙ্গিনী আমার গায়ের উপর এসে পড়লো। ফোঁপাবার মতো ক'রে বললে, 'বাবা, মনার সঙ্গে আমি আর কথা বলবো না।'

'কেন, কেন, মনার কী দোষ?'

'ও আমাকে বকেছে। ও পাজি, ও দুষ্টু, ও দরজা—'

'দরজা কেন ?'

আমার এ-প্রশ্নের কোনো জবাব দিলে না তরঙ্গিনী।—'আড়ি, আড়ি, মনার সঙ্গে আড়ি। আর কোনোদি—ন ওর সঙ্গে কথা বলবো না।'

'বেশ, না বললে। এখন লক্ষ্মী মেয়ের মতো ভাত খেয়ে নাও। তারপর ঘুমুবে।'

'না, আমি আজ খাবোও না, ঘুমুবোও না, কিচ্ছু করবো না।'

'কিচ্ছু করবে না ?'

'তোমার এখানে দাঁড়িয়ে থাকি, কেমন ? কোনো জিনিসে হাত দেবো না। আমি কি কোনোদিন তোমার টেবিল ধরি ?'

একটা বীভৎস বানান ভুলের উপর এত জোরে পেন্সিল চালালাম যে শিষটাই গেলো ভেঙে। বিরক্ত হ'য়ে আবার পেন্সিলটাকে কাটছি, তরঙ্গিনী বললে, 'তোমার ঐ পেন্সিলটার কাজ হ'য়ে গেলে আমাকে দেবে ?'

'এখান থেকে যাও, রঙ্গি, মা-র কাছে যাও।'

'বাবা, একটুখানি তোমার কোলে বসবো। বসি ?'

নাঃ, জ্বালালে মেয়েটা। ওকে কোলে নিয়েই খাতাটার পাতা ওল্টালাম।

'বাবা, জানালার কাচে ওটা কী দেখা যাচ্ছে বলো তো ?'

'তুমিই বলো।'

'চাঁদ! চাঁদ উঠেছে, বাবা। ছাখো না—দ্যাখো না তাকিয়ে!' তরঙ্গিনী আমায় গাল ধ'রে মুখ ফেরাবার চেষ্টা করলে।

'বাঃ, সত্যিই তো।'

'না, ভালো ক'রে দেখলে না। ঐ যে—ঐ দ্যাখো!'

'হুঁ।'

'আচ্ছা বাবা, তুমি চাঁদ ধরতে পারো ?...বলো না, বাবা। পারো ?'

'না, পারি না।'

'কেন পারো না ?'

'চাঁদ তো থাকে কত উঁচুতে—আমি কেমন ক'রে ধরবো ?'

'কেন, তুমি তো বড়োই হয়েছো ; আমার মতো তো আর ছোটো নেই। তুমিও পারো না ?'

৭, ৫ আর ১৮-ইয় একটা যোগফল সেরে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লুম। 'রঙ্গি, একটু নাম্ না কোল থেকে। তোর মা কোথায় ?'

'না, বাবা, আমি তোমার কাছেই থাকবো। জারুমামা পারে ?'

'কী পারে ?'

'চাঁদ ধরতে ?'

হেসে বললুম, 'না, লারুমামাও পারে না।' তরঙ্গিনীর এই মামাটি প্রায় ছ' ফুট লম্বা, এবং ভাগনির চোখে পৃথিবীর উচ্চতম মানুষ।

'লারুমামাও পারে না ? হাত বাড়ালেও না ? চায়েরে উঠে দাঁড়ালেও না ?'

'না, কিছুতেই পারে না। আর, রঙ্গি—ওটা চায়ের নয়, চেয়ার।'

'তবে কি চাঁদ ধরাই যায় না ?'

'যায়, খু—ব লম্বা একটা আঁকশি যদি পাও।'

'আঁকশি কাকে বলে, বাবা ?'

'আছে একরকম জিনিস।'

'তা দিয়ে চাঁদ ধরা যায় ?'

'চেষ্টা করতে পারো।'

'আমাকে একটা আঁকশি কিনে দিয়ো বাবা, দিয়ো ? আমি তা দিয়ে চাঁদ ধরবো।'

'কিন্তু অত লম্বা আঁকশি তো কিনতে পাওয়া যাবে না। ফরমায়েস দিতে হবে।'

'তবে ফরমায়েসই দিয়ো।'

'কিন্তু ও তো একদিন দু'দিনে তৈরি হবে না—অনেকদিন লাগবে।'

'অনে—ক দিন? চোদ্দ, বারো, ছত্রিশ, পনেরো দিন?'

'তার চেয়েও বেশি। বছর দশেক তো লাগবে।'

'দশ বছ—র! না, তারো বেশি! সাত বছর, সাত বছর লাগবে।' তরঙ্গিনী খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো।

এই সুযোগে আমি আর-একবার বললুম, 'রঙ্গি, লক্ষ্মী তো, একটু নামো কোল থেকে। দেখে এসো তো মা কী করছেন।'

আমার কথায় একেবারে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে তরঙ্গিনী বললে, 'আমাকে আঁকশিটা দিয়ো কিন্তু, বাবা।'

'বেশ ব'লে দেবো ওদের একটা আঁকশি তৈরি করতে।'

'কাদের বলবে?'

'যারা এ-সব বানায়।'

'খুব, খুউউব, খুউউউউউউব লম্বা হবে তো?'

'তা হবে।'

'তারপর সেটা দিয়ে আমি চাঁদকে ধরবো, ছোঁবো, পেড়ে আনবো—না, বাবা?'

'সে তো অনেকদিন পরে। আগে আঁকশি তৈরি হোক্ তো! এখন তো ওরা প্রাণপণে ছুটেছে কোথায় খুব লম্বা-লম্বা বাঁশ আছে, তারই খোঁজে।'

'বাঁশ দিয়ে কী হবে বাবা?'

'বাঃ, হাজার হাজার হাজার হাজার বাঁশ জোড়া দিয়ে তবে তো আঁকশি।'

'হাজার হাজার হাজার হাজার! সে কত?'

'সে অনেক। ওরা সব ছুটেছে বাঁশের খোঁজে, কেউ গেছে নোয়াখালি, কেউ মানিকগঞ্জ, কেউ ডায়মণ্ড হার্বর, কেউ বর্ধমান। দেশে যত বাঁশ আছে সব চাই।'

'স—ব চাই?'

'কোথায় নেত্রকোনা, কোথায় পিরোজপুর, কোথায় তমলুক, কোথায় হবিগঞ্জ, হাজার হাজার লোক শুধু বাঁশই কাটছে। দিন রাত খট্ খট্ ঘটাং ঘটাং—ধুলো উড়ছে, ঘাম ঝরছে, বাঁশঝাড়ের পর বাঁশঝাড় উজোড় হ'য়ে যাচ্ছে, তবু কি কাজ ফুরোয়! বাঁশের স্তূপ যতই জ'মে ওঠে, ততই কনট্রাক্টর অপাঙ্গ দস্তিদার মাথা নেড়ে বলে—না, না, হয়নি, হয়নি, আরো চাই।'

'তারপর?'

'খট্ খট্ ঘটাং ঘটাং আর থামে না। দেশের লোকের কানে তালা লাগবার জোগাড়। কী ব্যাপার? মস্ত আঁকশি তৈরি হবে, তরঙ্গিনী তা দিয়ে চাঁদ পাড়বেন। এক বছর যায়, দু'বছর যায়—এইভাবে পাঁচ বছর যখন কাটলো, তখন অপাঙ্গ দস্তিদার সাত কোটি চার লক্ষ পনেরো হাজার তিনশো একুশখানা বাঁশ গুনে দেখে বললে, হ্যাঁ, এইবার হয়েছে। আরে ব্বাবা—সে গোনাই কি সোজা! গুনতে পুরো সাতটি মাস লেগেছিলো, আর কলকাতা থেকে, লক্ষ্ণৌ থেকে, হয়দ্রাবাদ থেকে ষোলোজন নামজাদা অঙ্কের প্রোফেসর পাঁচ রীম কাগজ আর দু'শো বাহান্নটি পেন্সিল নিয়ে হিসেব করেছিলেন।—ইস্, কী যাচ্ছেতাই লেখে!'

'কী বললে, বাবা?'

'না, ও কিছু না।'

'তারপর আঁকৃশি তৈরি হ'লো?'

ওঃ, আঁকশি তৈরি হওয়া এত সোজা কিনা! মোটে তো এতক্ষণে বাঁশ জোগাড় হ'লো। সেগুলোকে চালান দিতে হবে না? নীলফামারি থেকে, ঝালকাঠি থেকে, মালদ, পোড়াদ, লাকসাম, নবীনগর থেকে রোজ হাজার হাজার বাঁশ কলকাতায়

এমনি ক'রে এক বছরের মধ্যেই সবগুলো বাঁশ খিদিরপুরের প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরিতে এসে জড়ো হ'লো।

আসতে লাগলো, এলো গোরুর গাড়িতে, মোটরলরিতে, নৌকোয় ইষ্টিমারে, রেলগাড়িতে, এলো মানুষের, মোষের, হাতির, উটের পিঠে—এমনি ক'রে-ক'রে এক বছরের মধ্যেই সবগুলো বাঁশ খিদিরপুরের প্রকাণ্ড ফ্যাক্টরিতে এসে জড়ো হ'লো।'

'তারপর, বাবা ?'

'এবারেই তো আসল ব্যাপার আরম্ভ। ওঃ, সে কী কাণ্ড! পাঁচ মাইল জোড়া ফ্যাক্টরি, আট হাজার লোক দশঘণ্টা ক'রে খাটছে, সমস্ত চব্বিশপরগনা জেলায় বেকার আর কেউ রইলো না। ছ'মাস পরে আমেরিকা থেকে নতুন একটি যন্ত্র এলো, তার ফলে দু'হাজার লোকের চাকরি গেলো। আবার আরো ছ'মাস পরে জর্মানি থেকে আর-একটা বিরাট যন্ত্র এলো, সেটা চালাবার জন্য আবার তিন হাজার লোকের চাকরি হ'লো।'

'তবু আঁকশি তৈরি হ'লো না ?'

'এই তো এবারে হচ্ছে। লোহা এলো, তামা এলো, প্লাটিনম এলো, মালগাড়ি বোঝাই নানা রঙের আর বিদঘুটে গন্ধের সব ওষুধ এলো; তিনজন বৈজ্ঞানিক এলেন জাপান থেকে; চেকোশ্লোভাকিয়ার এক জুতোর কারখানার ম্যানেজরকে ডবল মাইনে দিয়ে নিয়ে আসা হ'লো তদারক করতে। সারা দেশে হুলুস্থুল প'ড়ে গেলো। কী ব্যাপার ? আঁকশি তৈরি হচ্ছে, তরঙ্গিনী চাঁদ পাড়বেন। খবরের কাগজে, রেডিওতে, ট্রামে, বাস-এ, রেস্তোরাঁয় এ ছাড়া আর কথা নেই।'

'আমার আঁকশি—না বাবা ?'

'হাঁ, তোমারই তো।'

'আরো কি অনেকদিন লাগবে শেষ হ'তে?'

'না, এইবারে হ'য়ে এসেছে। এক বছর যায়, দু' বছর যায়, ঠিক সাড়ে-চার বছর পরে একদিন বাংলা, হিন্দি, তামিল, ইংরেজি, ফরাসি, জর্মান, রুশ, চীনে, জাপানি, আরবি, আফগানি পৃথিবীর সমস্ত খবরের কাগজে বড়ো-বড়ো অক্ষরে খবর বেরুলো—

আশ্চর্য আবিষ্কার

পৃথিবীর দীর্ঘতম আঁকশি

মানুষের হাতে চাঁদের গ্রেপ্তার

বঙ্গবালিকার অদ্ভুত খেয়াল

আরো অনেক সব কথা। তারপর একদিন মহাসমারোহে ইঞ্জিনিয়র, কনট্রাক্টর, ম্যানেজর, বৈজ্ঞানিক, গণিতবিদ, রাসায়নিক, সবাই মিলে তরঙ্গিনীর কাছে এসে উপস্থিত।

'কী ব্যাপার ?'

'আঁকশি প্রস্তুত। এবার তুমি চাঁদ ধরতে পারবে।'

'শুনে তরঙ্গিনী খিলখিল ক'রে হেসে ছুটে পালালো সেখান থেকে। সে তখন বেণী দুলিয়ে ইস্কুলে যায়, সামনের বার ম্যাট্রিকুলেশন দেবে। হাসতে-হাসতে তার পেট ব্যথা হ'য়ে গেলো—ওমা, চাঁদ নাকি আবার ধরা যায়।...রঙ্গি, রঙ্গি! এই রে, মুস্কিল হ'লো! এই সন্ধেবেলায়ই ঘুমিয়ে পড়লো মেয়েটা।'

তরঙ্গিনী তো ঘুমিয়ে পড়লো, কিন্তু গল্প তবু শেষ হ'লো না। আরো একটু আছে, ম্যাট্রিকুলেশনের খাতা এখনো শেষ হয়নি। কিন্তু তাও একদিন শেষ হ'লো, আর তার মাসখানেক পরে দেখি বেজায় ভারিক্কি চেহারার খামে ভরা একখানা চিঠি আমার নামে এসে হাজির। চিঠিতে লেখা :—

'প্রিয় মহাশয়,

আপনার প্রেরিত ম্যাট্রিকুলেশনের খাতাগুলো সম্বন্ধে আমাদের একটু বক্তব্য আছে। আপনি একটি খাতায় ৩½ আর

৪½-এর যোগফল বসিয়েছেন ৭, অন্য একটিতে ৭, ৫, আর ১৮½-র বসিয়েছেন ২৮½, অন্য একটিতে ২ আর ৩-এ ৪ যোগ করেছেন। এ-রকম আরো আছে। এ অবস্থায় ভবিষ্যতে এ-রকম দায়িত্বপূর্ণ কাজ আপনার চেয়ে যোগ্যতর কোনো ব্যক্তির হাতেই......'

চিঠিটা শেষ পর্যন্ত আর পড়লুম না।

তরঙ্গিনী আমার কানে-কানে চুপি-চুপি বললে, 'ও মামা, ওটা কী?'

তরঙ্গিনী নাম শুনে ঘাবড়ে যেয়ো না, এত বড়ো একটা গাল-ভরা নামের যিনি মালিক, দেখতে তিনি ছোট্ট, বয়েস চার। তাও এটা তাঁর আসল নাম নয়, আসলে তাঁর নাম এণাক্ষী কি মণিমালা কি বিশাখা (কোন্‌টা আমার ঠিক মনে নেই), আর তাঁর বাবা-মা তাকে ডাকেন বাব্‌লি কি হাব্‌সি কি কুট্টুস্‌—যখন যেটা মুখে আসে। আমি এঁকে ডাকি তরঙ্গিনী, কারণ ঢেউয়ের মতোই এঁর দাপাদাপি।

সে অবশ্য শুধু বাড়িতে। বাড়ির বাইরে (কি বাড়িতেও অচেনা লোকের সামনে) তরঙ্গিনীর আলাদা মূর্তি। মাথা নিচু ক'রে, ছোট্ট হাত দুটি শক্ত মুঠি ক'রে কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে—কেউ ডাকলে কাছে আসে না, চোখ তুলেও তাকায় না, বাড়ির লোকের সঙ্গে নেহাৎই কোনো কথা বলতে হ'লে বলে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস ক'রে। এই ছাখো না, গিয়েছি এক বন্ধুর বাড়ি নেমন্তন্ন খেতে, ওর সঙ্গে ভাব করতে বাড়ির সবাই ব্যস্ত, কিন্তু মেয়েটা গেলো কি কারো কাছে একটু! আমার জামার কোনা খিমচে ধ'রে সেই

যে শক্ত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো, কেউ একটু নড়াতে পর্যন্ত পারলে না।

দিদি ভারি কুনো করেছেন মেয়েটাকে।

এরি মধ্যে এক ফাঁকে—অর্থাৎ, অন্য সবাই যখন রান্নার আর কত দেরি খোঁজ করতে উঠে গেছেন, ঘরে আমি আর তরঙ্গিনীই আছি—ও আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললে 'ও মামা, ওটা কী ?'

ঘরের মেঝেতে পাতা চিতাবাঘের চামড়াটা ওকে অনেকক্ষণ ধ'রেই আকর্ষণ করছিলো। আমি বললুম, 'চেনো না ? কী বলো তো ?'

'ওটা কি বাঘ ?'

'হ্যাঁ—চিতাবাঘ।'

'ও, বুঝেছি। চিতাবাঘ। চিতাবাঘ।' নতুন কথা শেখবার আগ্রহ তরঙ্গিনীর অসীম; একটা কথা প্রথম শোনামাত্র দু'তিনবার আউড়িয়ে সেটা এমন রপ্ত ক'রে ফেলে যে মনে হয় জন্ম থেকেই সে কথাটা জানে।—'তা চিতাবাঘ বুঝি কামড়ায় না ?'

'তা কামড়ায় বইকি।'

'ও কামড়াবে ?' তরঙ্গিনী চোখ বড়ো ক'রে বললে।

'না—ও আর কামড়াবে কেমন করে? ও তো ম'রে গেছে।'

'ও, বুঝেছি, ম'রে গেছে।' তরঙ্গিনী গম্ভীরভাবে বললে বটে, কিন্তু চামড়ার যেদিকটায় দাঁত-বের-করা মাথাটা ছিলো, সেদিকে তাকিয়ে কথাটা বিশ্বাস করা তার পক্ষে বোধ হয় কঠিন হ'লো। তাই সে বললে, 'কিচ্ছুতে—ই কামড়াবে না? গায়ে হাত দিলেও না?'

'ছাখো না গায়ে হাত দিয়ে। এই ছাখো!' চামড়াটির উপর একটু হাত বুলিয়ে ওকে অভয় দিলুম। তরঙ্গিনী নিচু হ'য়ে ওর লেজের দিকটা দু' আঙুল দিয়ে আস্তে একটু ছুঁয়েই হাত সরিয়ে আনলো।

'দেখলে তো?'

এবার আর একটু সাহসী হ'য়ে তরঙ্গিনী চামড়াটির গায়ে দু' একবার হাত বুলোলো, কিন্তু মাথার দিকে এগুলো না। তারপর আমার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটা দার্শনিক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলে, 'মামা, ও কি সত্যিকারের বাঘ?'

'তা নয় তো কী?'

'বানানো বাঘ নয়?'

আমি বললুম, 'বাঘ আবার বানাবে কে?'

'তবে ও নড়ে না কেন? ডাকে না কেন? কামড়ায় না কেন?'

'বললুম যে ও ম'রে গেছে।'

'ও, ম'রে গেছে। কী ক'রে মরলো?'

'দুষ্টুমি করতে গিয়ে।'

'খুব দুষ্টু ছিলো বুঝি ও?'

'ওঃ, ভীষণ দুষ্টু। ও ছিলো ছোট্ট চিতাবাঘ—বাপ-মার কথা একটুও শুনতো না।'

'আমাকে একটা ছোট্ট চিতাবাঘ কিনে দিয়ো—আমি খেলা করবো। দিয়ো কিন্তু।'

আমি বললুম, 'আচ্ছা।'

'চিতাবাঘটা কেন দুষ্টু ছিলো, মামা?'

'দুষ্টু ব'লেই দুষ্টু ছিলো। তুমি দুষ্টুমি করো কেন?'

'আমি তো এ—কটু-উ-উখানি দুষ্টুমি করি। বেশি তো করি না।'

'তা করবে কেন—তুমি তো ভালো মেয়ে। আর ও ছিলো খু—ব দুষ্টু ছেলে।'

'কী করতো ?'

'কী না করতো ! একা-একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতো, হরিণ আর বাছুর মারতো, একদিন তো একটা মোষই মেরে ফেললো। বাপ বলতেন, "তুই এখনো ছোটো আছিস, ও-সব বড়ো জানোয়ার মারতে-টারতে যাসনে।" তা কে কার কথা শোনে।'

'কেন মারতো ?'

'কেন আবার ? খেতো।'

'চিতাবাঘেরা বুঝি বাছুর হরিণ মোষ-টোষ খায় ?'

'তা না খেয়ে আর কী করে ! খিদে তো পায়।'

'ও, বুঝেছি। দুষ্টু চিতাবাঘকে বুঝি একদিন একটা মোষ মেরে ফেললে ?'

'না, মোষের সাধ্যি কি চিতাবাঘ মারে !'

'তবে ওকে কে মারলে ?'

'মানুষেই মেরেছে।'

'কেন ? মানুষ কি চিতাবাঘ খায় ?'

'না, খায় না। ঘরের মেঝেতে চামড়া সাজিয়ে রাখে। দেখছো না ?'

'কেন মারলো এই চিতাবাঘকে ? ও কী করেছিলো ?'

'ওঃ, যা দুষ্টু ছিলো ও, একদিন মারা পড়বে জানা কথা। বাড়িতে ভালো-ভালো ষাঁড়, মোষ, ছাগল, হরিণ—কত যে খাবার তার অন্ত নেই। মা ভারি ভালোমানুষ—ভাঁড়ারে চাবিও দিতেন না, ও যখন খুসি যা খুসি খেতে পারতো। ওর বাপ জঁাদরেল জঙ্গির এক ডাকে সারা জঙ্গল কাঁপতো, তাই দেখে ওর সাহস অত্যন্ত বেড়ে গিয়েছিলো—রোজই নতুন-নতুন জানোয়ার মেরে নিয়ে আসতো। বাপকে বলতো, "বাবা, তুমি চুপ ক'রে ঘরে ব'সে থাকো, এখন থেকে আমিই সব জানোয়ার মারবো।" '

'ওর নাম কী ছিলো?'

'ওর নাম? ওর নাম ছিলো—রঙ্গী। দেখছো তো ওর গায়ে কত রং।'

'আমাকে একটা ছোট্ট, রঙ্গী চিতাবাঘ কিনে দিয়ো?'

'আচ্ছা, দেবো।'

আমার আর বকবক করতে ভালো লাগছিলো না, খিদেও পেয়েছিলো। কিন্তু বন্ধুদের রান্নার বোধ হয় এখনো দেরি, কারুরই দেখা নেই। একটু চুপ ক'রে থেকে তরঙ্গিনী বললে, 'আচ্ছা মামা, মানুষ ওকে মারলো কী ক'রে? ওর তো কত

রঙ্গী ও জাঁদরেল জজি

বড়ো-বড়ো দাঁত, কী লম্বা-লম্বা নখ—মানুষের ভয় করলো না ?'

'মানুষের আবার ভয় কী ? বন্দুকই তো আছে হাতে।'

'ও, বুঝেছি।'

এটা কিন্তু তরঙ্গিনীর চালিয়াতি। বন্দুক কাকে বলে সে জানে না, চোখেও ছ্যাখেনি। বন্দুক বলতে ও কী বুঝলো ও-ই

জানে, কিন্তু দিব্যি গম্ভীরভাবে বললে, 'বন্দুক দিয়ে মেরেছিলো ওকে ?'

'হ্যাঁ। ঠিক কপালের উপর গুলিটা লেগেছিলো।'

'এইখানে ?' তরঙ্গিনী তার দু'চোখের মাঝখানে কপালের উপর একটা আঙুল রাখলো।

'ঠিক ওখানে। দেখছো না ওর ওখানটায় একটা ছোট্ট গর্ত, ওটা গুলির দাগ।'

'কপালে গুলি লাগলে কী হয়, মামা ?'

'লাগলে আর কথা আছে !'

'ম'রে যায় বুঝি ?'

'তা আর বলতে !'

'তা ছোট্ট চিতাবাঘ পালাতে পারলো না ?'

'পালাবে কোথায় ? গুলি তো দূর থেকেও ছোঁড়া যায়। মা-র কথা যেমন শোনেনি, তেমনি জব্দ।'

তরঙ্গিনী খুব চাপা গলায় বললে, 'আমি সব সময় মা-র কথা শুনি—না, মামা ?'

'হ্যাঁ, তুমি তো খুব লক্ষ্মী মেয়ে।'

'ছোট্ট চিতাবাঘ কেন লক্ষ্মী হ'লো না, মামা ?'

খাবার আগের গল্প

'তাহ'লে আর ভাবনা ছিলো কী! এই দ্যাখো না—সেদিন ওর মা বললেন, "বাবা রঙ্গী, আজ আর বাড়ি থেকে বেরিয়ো না।" তা রঙ্গী কি কথা শোনে! বলে, "কেমন একটা নতুন রকমের গন্ধ পাচ্ছি, মা। ভারি খাসা গন্ধ, জিভে জল আসে।" এ-কথা শুনে রঙ্গীর মা-বাবা মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক'রে হাসলেন। বাপ বললেন, "হাঁউ-মাউ-কাঁউ", আর মা বললেন, "মানুষের গন্ধ পাঁউ।"

'এ-কথা শুনে রঙ্গী বললে, "মানুষ! সে-আবার কী রকম জানোয়ার?' বাপ বললেন, "ওঃ সে এক কিম্ভুত জীব। তবে খেতে খাসা। হ'লে কী হবে—পাওয়া যায় না। আমি যখন ছোটো, আমার বাবা একটা মেরেছিলেন—তারপর আর খাইনি।" রঙ্গী বললে "কিছু ভেবো না, বাবা, আমি তোমাকে মানুষ খাওয়াবো।"

'ছেলের কথা শুনে মা শিউরে উঠলেন। বললেন, "রঙ্গী, লক্ষ্মী, সোনা আমার, বাহাদুরিতে কাজ নেই বাবা, মানুষ না-খেলেও আমাদের চলবে, তুই ওদের কাছে ঘেঁষিস নে। ওরা বড়ো ভয়ানক! ওরা সামনের দু'পা দিয়ে কী একটা লম্বামতো জিনিস ধ'রে থাকে—উঃ সে বড়ো সাংঘাতিক জিনিস। কথা শোন্,

রঙ্গী, হাতি খেতে চায় হাতি খাওয়াবো—কিন্তু মানুষের নামও মনে আনিসনে।"

'এ কথা শুনে জাঁদরেল জঙ্গি বললেন, "ওয়াক ! হাতি আবার একটা খাওয়ার জিনিস ! তা তোর মা ঠিক বলছেন, রঙ্গী ; জঙ্গলে মানুষ এসেছে যখন, তখন দু' এক দিন একটু সাবধানেই থাকা ভালো। ওরা দেখতে নিরীহ, কিন্তু কাজে শয়তান, না পারে এমন কাজ নেই।" '

তরঙ্গিনী রুদ্ধশ্বাসে বললে, 'তারপর কী হ'লো, মামা ?'

'তারপর যা হবার তা-ই হ'লো ! রঙ্গী শুনলে না কথা। ছেলেকে অনেক বুঝিয়ে বাপ একটু বেরিয়েছেন—গোটাচারেক হরিণ মেরে আনতে পারলেই আজকের মতো হয়ে যায়, আর মা গেছেন সিঙ্গিদের পুকুরে জল খেতে—এমন সময় এদিক-ওদিক তাকিয়ে রঙ্গী দে ছুট। ঘুটঘুটে কালো রাত্তির—তা বাঘেরা কিনা অন্ধকারেও চোখে দেখে—ঝোপ সরিয়ে, পাতা ঝরিয়ে, ডাল কাঁপিয়ে রঙ্গী আস্তে-আস্তে এগুতে লাগলো। ওঃ, চমৎকার গন্ধ মানুষের, সারা জঙ্গল ভ'রে গেছে। একটা মানুষ সে আজ মেরে আনবেই—বাবা কী খুশিই হবেন, আর মা তো অবাক হ'য়ে হাঁ ক'রে থাকবেন—ও-মা, আমাদের ঐটুকু রঙ্গী, তার

নাকি এত কেরামতি! গন্ধ শুঁকে-শুঁকে সে এগুতে লাগলো, এ-গন্ধ যত ভালো, মানুষ যদি খেতেও তত ভালো হয়, তাহ'লে আর কথা কী! পরমকারুণিক পরমব্যাঘ্র বাঘেদের খাবার

জন্যেই মানুষগুলোকে তৈরি করেছেন। এখন পর্যন্ত মানুষ সে চোখে দ্যাখেনি, কিন্তু রক্তে-ভেজানো, হাড়ে-মেশানো নধর মাংস কল্পনা ক'রেই তার জিভ দিয়ে খালি লালা গড়াতে লাগলো।

'বাড়ি ছেড়ে কতদূর এসে পড়েছে তার খেয়াল নেই। হঠাৎ রঙ্গীর মনো হ'লো, গন্ধটা যেন বড়োই কাছে। সামনের দু'পায়ে ভর দিয়ে সে একটু বসলো, তারপর একবার এপাশে, একবার

ও-পাশে তাকালো। তারপর সে আর চোখ ফেরাতে পারলে না। ঘুটঘুটে অন্ধকার চিরে তীব্র আলো ঠিক তার চোখের উপর এসে পড়লো, আলো দিয়ে তাকে যেন বিঁধে ফেলা হ'লো। এমন আলো সে দ্যাখেনি। একটু পরেই গুড়ু—ম্ শব্দে সমস্ত বন একবার কেঁপে উঠলো, হুঙ্কার ছেড়ে জঙ্গি লাফিয়ে উঠলো শূন্যে, তারপর ধুপ ক'রে পড়লো একটা ঝোপের উপর। আর উঠলো না।'

—'চলো এবার, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলুম তোমাদের,' বলতে-বলতে বন্ধু ঘরে ঢুকলেন।

'চলো,' আমি খুশি হ'য়ে উঠলাম। বেশ চনচনে খিদে পেয়েছিলো। 'চলো তরঙ্গিনী, খাওয়া যাক।'

তরঙ্গিনী শক্ত ক'রে আমার জামা আঁকড়ে ধ'রে বললে, 'মামা, আমার বড্ড কান্না পাচ্ছে।'

আমি বললুম, 'দূর বোকা মেয়ে!'

রেডিও
রাখার
মূল্য

আমার হাতে টাকা এসে একদিনের বেশি দু'দিন দাঁড়ায় না। খরচ হবার জন্য টাকাগুলো এমন ভীষণ আকুলিবিকুলি করে যে যতক্ষণ ওর একটি পয়সাও বাকি থাকে, আমার ভিতরে অসহ্য যন্ত্রণা বোধ করি। সব ফুরোলে তবে আমার রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়।

এই সেবার ফাঁকতালে কিছু টাকা পেয়ে গেলুম—তক্ষুনি মনে হ'লো একটা রেডিও কিনি। কেন মনে হলো জানি না। রেডিও আমার দু'চক্ষের বিষ। কোনো বাড়িতে রেডিও বাজলে আমার মনে হয় ঢিল ছুঁড়ি। রেডিও শুনে যারা সময় কাটায় তারা, আমার মতে, নিষ্কর্মার ঢেঁকি। আমার বাড়িতে যে কোনোদিন রেডিও থাকবে এমন কথা দু'দিন আগে আমি কল্পনা করতে পারতুম না; কিন্তু যেই কিছু বাড়তি টাকা হাতে এলো, তক্ষুনি মনে হলো রেডিও ছাড়া একদিনও আমার কাটবে না। কারো সঙ্গে দেখা হলে কথা-বার্তাটা কায়দা ক'রে রেডিওর দিকে ফেরাবার চেষ্টা করি: 'মশাই, কোন্ রেডিও ভালো?' বন্ধুরা বাড়ি এলে জিজ্ঞেস করি, 'ওহে, কোনো রেডিওর দোকান চেনা আছে?' কেউ এ-কথা বলে, কেউ ও-কথা, নানারকম আলোচনায় ও পরামর্শে

উদ্‌ভ্রান্ত বোধ করি। এক-এক সময় মনে হয়, দূর ছাই, রেডিও না-কেনাই ভালো।

দুঃখের বিষয়, মানুষের সুবুদ্ধি স্থায়ী হয় না।

শেষটায় একদিন মনে হলো যে পরামর্শের পরিমাণ ও পরামর্শদাতার সংখ্যা যদি কেবলই বেড়ে চলে তাহ'লে হাতের টাকা ক'টা অন্য কোনো দিকে পাখা মেলে উড়ে যাবে, রেডিওর দোকান অবধি পৌঁছবে না। মাঘ মাসের তেরো তারিখে, তাই, দুপুরবেলা খেয়ে-দেয়েই বেরিয়ে পড়লুম পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে। এ ভরা পকেট অচিরেই খালি হ'য়ে যাবে ভেবে ভারি ফুর্তি হচ্ছিলো মনে। মনে-মনে স্থির ছিলো, ট্র্যামে যেতে-যেতে প্রথম যেখানে রেডিওর দোকান দেখবো, সেখানেই নেমে পড়বো।

বেশিদূর যেতে হ'লো না, রসা রোডের মোড়েই দেখি মস্ত এক রেডিওর দোকান। আগে তো এ-দোকান কোনোদিন লক্ষ্য করিনি, নিশ্চয়ই নতুন হয়েছে। আমার মনে হ'লো, আমি রেডিও কিনবো ব'লেই এরা দোকান খুলেছে। তক্ষুনি নেমে পড়লুম ট্র্যাম থেকে।

সরাসর দোকানে ঢুকে বললুম, 'মশাই, আমি একটা রেডিও কিনবো।'

রেডিও রাখার সুখ

সবসুদ্ধ পনেরো মিনিটের বেশি ছিলুম না দোকানে। প্রথম যে-সেট্‌টি চোখে পড়লো সেটিই আমার পছন্দ হ'য়ে গেলো, দামও মানানসই। সেট, এরিএল, লাইসেন্স সবশুদ্ধ দু'শো বারো টাকা চোদ্দ আনা গুনে দিয়ে শিষ দিতে-দিতে বাড়ি ফিরে এসে শুয়ে পড়লুম। টাকাগুলো নিজের হাত থেকে পরের হাতে গছাতে পেরে শরীরে ভারি একটি আরাম অনুভব করছিলুম।

কিন্তু বেশিক্ষণ আরাম ভোগ করা হলো না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই রেডিওসেট, মস্ত দুটো বাঁশ আর যন্ত্রপাতি নিয়ে দোকান থেকে লোক এসে উপস্থিত। ঘণ্টাখানেক পরে ওরা যখন বিদায় নিলে তখন আমার বসবার ঘরে একটি ঝকঝকে নতুন রেডিও শোভা পাচ্ছে, কেউ গিয়ে দয়া করে চালিয়ে দিলেই হয়।

দুই

সেদিন সন্ধেবেলা, বিমল, শোভন, মণিলাল সবাই এসে বললে, 'বাঃ, সুন্দর সেট্‌টি তো! কবে কিনলে?'

'এই তো আজই কিনলুম।'

'বেশ হলো, লক্ষ্ণৌর ঠুংরি শোনা যাবে,' বললে শোভন।

ঘুমের আগের গল্প

মণিলাল বললে, 'আরে দূর! গান-ফান শুনে কী হবে, গরম-গরম ফরেন নিউজ—'

আমি গম্ভীরভাবে বললুম, 'হ্যাঁ, পৃথিবীর সব স্টেশনই ধরা যায়। শুনবে?'

ব'লে তাদের অনুমতির অপেক্ষা না-ক'রেই আমি উঠে গিয়ে রেডিওর চাবি ঘুরিয়ে দিলুম। একটু পরেই যন্ত্রটার ভিতর থেকে এমন একটা বিকট শব্দ বেরুলো যে আমি চমকে উঠলুম। কাঁটাটা আস্তে-আস্তে একপ্রান্ত থেকে আর এক-প্রান্তে নিয়ে গেলুম—কোথাও অদ্ভুত ভাষায় কথা, কোথাও বা গান-বাজনার ক্ষীণ শব্দ কানে এলো, কিন্তু তার সঙ্গে-সঙ্গে কানে এলো ঝড়ের, বজ্রের আর হাওয়ার শব্দ, আর নানারকম জন্তু জানোয়ারের ডাক—কিচ্‌মিচ, ঘোঁৎঘোঁৎ, কিড়িং-কিড়িং—অত রকম বিচিত্র শব্দ একসঙ্গে আমি কখনো শুনিনি।

বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে কপাল কুঁচকে বললুম, 'আজ ওয়েদরটা ভাল নেই, তাই—' ব'লেই মিটার ব্যাণ্ড বদলেই চেঁচিয়ে উঠলুম—'ওহে, শোনো, শোনো, যুদ্ধটা featurise করছে—'

সকলেই রেডিওর দিকে একসঙ্গে কান ও চোখ ফেরালো। তারপর মিনিট কয়েক—কখনো বোমা, কখনো শেল্‌, কখনো এরোপ্লেনের আওয়াজ, কখনো বা মুমূর্ষু মানুষের গোঙানি—সব

মিলিয়ে এক এলাহি কাণ্ড! আমি খুব মন দিয়ে শুনছি আর ভিতরে-ভিতরে রোমাঞ্চিত হচ্ছি, হঠাৎ বিমল ব'লে উঠলো, 'বন্ধ করো ওটা, বড্ড বেশি disturbance হচ্ছে।'

আমি বললুম, 'Disturbance ? Disturbance মানে ? বোমা—শেল্—অ্যান্টি-এআরক্রাফ্‌ট্—'

'তোমার মুণ্ডু!' ব'লে উঠলো বিমল। 'নাও, কোনো একটা জায়গায় গান-টান দাও, একটু শুনি।'

মর্মাহত হয়ে অগত্যা কলকাতা ধরলাম। একটা ভাটিয়ালি গান মাঝখান থেকে আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত রেডিও সম্বন্ধে আলোচনা হলো। চুংকিং থেকে, তোকিও থেকে, লণ্ডন থেকে, মস্কৌ থেকে কখন ইংরিজি, কখন বাংলা কখন হিন্দি খবর বলে, কোন্-কোন্ মিটারে সে-সব পাওয়া যায়, সেগুলো আমি একটা কাগজে টুকে নিলুম। ওঃ, কী সহজে, কী শস্তায়, সমস্ত পৃথিবীকে ঘরে ব'সে পাওয়া যায়! আজব কলই বানিয়েছে!

তারপর কয়েকদিন রেডিও চালানো ছাড়া আমার আর কাজ নেই। রাত তিনটের সময় নিউ ইয়র্ক থেকে খবর পাওয়া যায়—দুর্ভাবনায় ঘুম হয় না। সারাদিন রেডিওর সামনেই হাজির আছি। পিঠ টনটন করে, তাকিয়ে থাকতে-থাকতে

চোখে জল ঝরে, গরমে মাথা ধ'রে যায়, কিন্তু আমি নাছোড়বান্দা। এদিকে কাঁটা যখনই যেখানে দিই, মনে হয় রেডিওর মধ্যে একসঙ্গে ভূত প্রেত পিশাচ দানব ডাইনি শাঁকচুন্নি সব একসঙ্গে তুমুল চীৎকার করছে। বাড়ির লোক ঝালাপালা, আমার প্রাণান্ত, যদিও মুখে সে-কথা স্বীকার করি না।

রেডিওর সঙ্গে আমার লড়াই যখন চরমে এসে ঠেকেছে তখন আমার পিসতুতো ভাই গবা নীলফামারি থেকে কলকাতায় বেড়াতে এলো। বসবার ঘরে ঢুকেই বললে, 'বাঃ, সান্নু-দা রেডিও কিনেছো, দেখছি। বেশ করেছো।' ব'লেই, বলা নেই কওয়া নেই, ঝাঁ ক'রে রেডিওর চাবিটা টিপে দিলো—দারুণ চীৎকারে কোথায় যেন একটা নাচের বাজনা বেজে উঠলো।

আমি একবার বলতে গেলুম, 'আরে আরে করো কী—' কিন্তু আমি হাঁ না-করতেই গবা ব'লে উঠলো, 'জানি, সবই জানি। এই দেখুন কলকাতায় দিচ্ছি।' ব'লে সে ঘ্যাঁচাং করে মিটার ব্যাণ্ড বদলে কলকাতার মহিলা-মহল শুনতে ব'সে গেলো।

তারপর থেকে রেডিওটা গবারই সম্পত্তি হ'য়ে উঠলো। সে যখনই আসে, একটানা তিন-চার ঘণ্টা রেডিও চালায়—ওটাকে নিয়ে খেলা করে বললে ঠিক হয়—এই দিল্লি, এই লক্ষ্ণৌ, এই ঢাকা, এই লাহোর, আর তার কৌতূহল যখন কিছু মেটে, তখন

রেডিও রাখার সুখ

'বাঃ সানু-দা রেডিও কিনেছো দেখছি। বেশ করেছো।'

কলকাতা। বাংলা খবর, উড়ে খবর, হিন্দি খবর, ইংরেজি খবর, কেত্তন, ভাটিয়ালি, গজল, আধুনিক, কাব্যসংগীত— কত কিছু যে পর-পর হয়ে যাচ্ছে, আর গবাবাবু ঠায় ব'সে আছেন।

এবার আমি সুদ্ধ ঝালাপালা! এমন অবস্থা হলো যে গবা যখন থাকে না তখন রেডিওটা আর ছুঁয়ে দেখতেও ইচ্ছে করে না—মনে হয়, এ আপদ বিদেয় হ'লেই যেন বাঁচি।

কিন্তু ইচ্ছাময় আমার এ ইচ্ছা এমনভাবে পূরণ করবেন জানতুম না।

গত মঙ্গলবার দুপুরবেলা ও-ঘরে ব'সে গবা কলকাতার স্কুল-প্রোগ্রামে কৃষি বিষয়ক একটি বক্তৃতা শুনছে, আর আমি এ-ঘরে ঘুমোবার ব্যর্থ চেষ্টা করছি, হঠাৎ কানটা জুড়োলো, মন শান্ত হলো, অবাক হ'য়ে উপলব্ধি করলুম যে গবা এ-বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও রেডিও চুপ করেছে। একটু পরে গবা হাসতে-হাসতে এসে ঢুকলো।

—'সানু-দা, তোমার রেডিওটা আর বাজছে না।'

'উঁ?'

'তোমার রেডিওটা আর বাজছে না। হঠাৎ একদম চুপ ক'রে গেলো, আর কী-রকম পোড়া-পোড়া গন্ধ বেরুলো। এখনো বেরুচ্ছে। দেখতে পারো গিয়ে।'

রেডিও রাখার সুখ

'সানু-দা, তোমার রেডিওটা আর বাজছে না।'

এক লাফে বিছানা ছেড়ে রেডিওর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। সত্যি, পিছন দিক থেকে একটা পোড়া-পোড়া গন্ধ বেরুচ্ছে। চাবি ঘোরালুম, আলো জ্বললো, কিন্তু কোনো-রকম আওয়াজ আর বেরুলো না। যে-রেডিওর ভিতর থেকে

ভূতপ্রেতের চ্যাঁচামেচি এতদিন আমাকে এত জ্বালিয়েছে, তার এই অতি সভ্য ব্যবহারে খুশি হওয়াই হয়তো আমার উচিত ছিলো, কিন্তু ঠিক খুশি হ'তে পারলুম না। মনে হলো, ভদ্রতার যেন একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে। গান না বাজুক, বাজনা না চলুক, খবর না শোনাক্, অন্তত একটু গ্যাঁ-গোঁ ক্যাঁ-কোঁ করতে দোষ কী! কিন্তু না, কিচ্ছু না; একেবারে চুপ। একেবারে বোবা।

গবা আমার পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিবো; আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই বললে, 'নষ্টই হয়েছে ওটা, সারাতে দিতে হবে। তোমার রেডিওটা একদম বাজে, সানু-দা, নয়তো এতেই নষ্ট হয়! শস্তা জিনিস কত আর টিঁকবে। এই তো আমাদের দিনাজপুরের সদর এস্‌ডিওর বাড়িতে সাড়ে সাতশো টাকা দামের একটা রেডিও আছে—আমি কত চালাই সেটা—কই, কোনোদিন তো কিচ্ছু হয় না!'

ব'লে গবা হাসতে-হাসতে বেরিয়ে গেলো।

তিন

আমার খবর পেয়েই দোকান থেকে তাড়াতাড়ি লোক এলো—ভারি ভদ্র ওরা।

রেডিও রাখার সুখ

ভদ্রলোকটি রেডিওটা খুলেই আবার বন্ধ ক'রে রাখলেন। বললেন, 'আচ্ছা, আজ এটা নিয়ে যাই—চার পাঁচদিন লাগবে সারাতে।'

আমি ক্ষীণস্বরে বললুম, 'কী হয়েছে?'

'বিশেষ-কিছু হয়নি। ঠিক হ'য়ে যাবে, ভাববেন না।'

'কত—কত খরচ পড়বে বলতে পারেন?'

'খরচ? খরচ আর কত হবে! এই ধরুন শ' দেড়েক টাকা—তাও যুদ্ধের বাজার ব'লে—আগে একশো টাকার মধ্যেই হ'তো। পাঁচটা ভাল্‌ভই পুড়ে গেছে কিনা, আর তাছাড়া...'

কিন্তু ভদ্রলোকের বাকি কথা আমি শুনতে পেলুম না, কারণ ওটুকু শুনেই আমি তক্ষুনি মাথা ঘুরে প'ড়ে গেলুম।

হৃদয়-বিদারক ঘটনা

বই লিখে আমার নাম হয়েছে সেটা অস্বীকার করতে পারিনে। রোজগারও ভালো, যদিও বাইরের লোক যতটা বলে ততটা নয়। নানা বয়সের ভক্তদের কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত চিঠিপত্র আমি প্রায়ই পেয়ে থাকি। শালকেতে, বাজেশিবপুরে, চেৎলায় ও আলমবাজারে আমি সাহিত্যসভায় সভাপতিত্ব করেছি, খবরের কাগজে ফোটো বেরিয়েছে, আরো কিছুদিন বেঁচে থাকলে যে খোদ ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সম্বর্দ্ধনা হবে না সে-কথা জোর ক'রে বলা যায় না।

তোমরা মনে করতে পারো যে আমি বেশ আছি। আমার নিজের মতও অনেকটা সেইরকম। তবে কী জানো, অবিমিশ্র সুখ সত্যি বুঝি জগতে নেই। আমি জানি, আমাকে যারা হিংসে করে তারা আমার খ্যাতিটাকেই হিংসে করে। কিন্তু বিশ্বাস করো তোমরা, খ্যাতিতে কোনো সুখ নেই। যখন দেখতে পাই—উঃ, ঐ ঘৃণিত নামটাও মুখে আনতে হ'লো—না, আরো মর্ম্মান্তিক—যে-কলম দিয়ে আমি 'রহস্যশতক' 'জাল ইন্দ্রের ইন্দ্রজাল' 'কঙ্কালের কলঙ্ক' প্রভৃতি স্বনামধন্য বইগুলো লিখেছি, আমার সেই দশ বছরের পুরোনো ওয়াটারম্যান দিয়ে সেই ঘৃণিত নামটা লিখতে হ'লো!—যখন দেখতে পাই যে দিঙ্‌নাগ পালও একজন

'বিখ্যাত' লেখক, তার বইও লোকে কেনে এবং পড়ে, তার ছবিও কাগজে ছাপা হয়, মাঝেরহাট কি বেহালা কি লিলুয়াতে সে-ও সভাপতিত্ব করতে যায়, তখন আমি বুঝতে পারি খ্যাতি কত অসার জিনিস, আমার এই খ্যাতিকে রাস্তার কাদায় ছুঁড়ে পা দিয়ে থেঁৎলে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। কিন্তু হায়, বাংলাদেশে বিখ্যাত হওয়া সোজা হ'তে পারে (দিঙ্‌নাগ পালই তো তার উদাহরণ !) কিন্তু একবার খ্যাতি অর্জন করলে আবার অ-খ্যাত হওয়া অসম্ভব। যতই আমি একে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি, ততই এ ছিনে-জোঁকের মতো আমার গায়ে লেগে থাকে, এবং আমারই রক্তে দিন-দিন বর্ধিত হয়। মনের দুঃখে এক-একবার ভাবি যা হয়েছে হয়েছে, এর পর আর নতুন কিছু লিখবো না, তা হ'লেই লোকে আস্তে-আস্তে আমাকে ভুলে যাবে ; কিন্তু একদিকে সম্পাদক ও প্রকাশকের তাড়ায়, অন্যদিকে টাকা দরকারি জিনিস ব'লে সেটা সম্ভব হয় না।

তোমরা নিশ্চয়ই ঐ লোকটার লেখা পড়েছো। (দু' বার নাম করেছি, আর পারবো না, মাপ কোরো।) তোমাদের দোষ দিইনে—দেশসুদ্ধ লোকই ওকে নিয়ে লাফাচ্ছে, আর তোমরা তো ছেলেমানুষ ! আমি অবাক হ'য়ে ভাবি যে, সমস্ত লোক কি এতই বোকা যে এটাও বুঝতে পারে না যে ঐ

লোকটার লেখায় ছত্রে-ছত্রে বানান ভুল, ভাষার ভুল, গল্পের মাথামুণ্ডু কিছু নেই, কাতুকুতু দিয়ে হাসায়, বহুরূপী সেজে ভয় দেখায়, মড়াকান্না কেঁদে চোখে জল আনে। ও যদি লেখক হয় তবে লেখক কে নয়? সূত্রপাতেই তাকে একেবারে থামিয়ে দেয়া উচিত ছিলো; যার যোগ্য জায়গা একমাত্র পাটের গুদোম, যার যোগ্য কাজ একমাত্র হিসেব লেখা, তাকে বাহবা দিয়ে বাড়িয়ে তুলে এমন হয়েছে যে তার নিজেরই মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে; যত ঘোরতর রাবিশই লিখুক, মনে ভাবে কী একখানা কাণ্ডই ক'রে ফেলেছে! আমার পক্ষে সব চেয়ে হৃদয়-বিদারক ঘটনা এই যে ঐ লোকটা নিজেকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে—এমনকি, এ-ও মনে করে যে আমি ওকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করি! সেই ধারণা থেকে লোকে যখন ওর সঙ্গে আমার (ধরণী, দ্বিধা হও!) তুলনামূলক সমালোচনা লেখে তখন আমার সত্যি মনে হয় যে পৃথিবীতে না-জন্মালেই ভালো ছিলো। আমার কোনো-কোনো ভক্ত এসে যখন বলে, 'সত্যি, আপনার লেখা! কোথায় লাগে—! (ঐ লোকটার নাম ক'রে)' তখন আমার ইচ্ছে করে ঐ ভক্তকে কড়াইতে চাপিয়ে গরম তেলে ভাজি।

এ-সব কারণে, বাইরে থেকে যা-ই মনে হোক্, মনে আমার সুখ নেই। আর মনে সুখ নেই ব'লে শরীরও খারাপ হ'য়ে

যাচ্ছে। এই অল্প বয়সেই ডিস্‌পেপ্‌সিয়ায় ধরেছে, ডাক্তাররা ব্লাড প্রেশার সম্বন্ধে সাবধান থাকতে বলছেন। বুঝতে পারছি, আমার ভবলীলা আর বেশিদিন নেই। ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউটের সম্বর্দ্ধনা ঐ লোকটার কপালেই আছে। ওটার আবার ষাঁড়ের মতো শরীর কিনা!

সত্যি-সত্যি আমার শরীর সেবার এতই খারাপ হ'য়ে পড়লো যে ভাবলুম কলকাতার বাইরে কিছুদিন কাটিয়ে আসি। বাইরে গেলে হয়তো ঐ লোকটার নামও কানে কম আসবে, ভক্তদের সঙ্গে দেখা হবে না, খবরের কাগজ না খুললেও চলবে···সব রকমই সুবিধে। পুজোর আগে 'রক্তমাখা হাতে' লিখে কড়কড়ে পাঁচ শো টাকা পেয়ে গেলুম; *সঙ্গে-সঙ্গে* তল্পিতল্পা গুটিয়ে আমার দারজিলিং যাত্রা। কাউকে জানতে দিলুম না কোথায় যাচ্ছি; বাড়িতে ব'লে গেলুম যে আমার নামের কোনো চিঠি, পত্রিকা কি খবরের কাগজ পাঠাতে হবে না, এবং কেউ জিজ্ঞেস করলে আমার ঠিকানাও যেন না দেয়া হয়। কিছুদিন শান্তিতে কাটিয়ে আসি।

দারজিলিং-এ সল্ট হিল্ রোডে বাড়ি নিয়েছিলুম। বাড়িটি অকল্যাণ্ড রোড থেকে অন্তত দু'শো ফুট উঁচুতে, বুক-ভাঙা পথ। অনেকে সেটা অসুবিধে মনে করতে পারেন, কিন্তু আমার পক্ষে

তাতে ছিলো ডবল সুবিধে। প্রথমত, ওঠা-নামায় আমার ডিস্‌পেপ্‌সিয়া সারবে; দ্বিতীয়ত, এখানেও যদি ভক্তের উৎপাতের আশঙ্কা থাকে, তবে ঐ দু'শো ফুট চড়াই আমাকে কিছুটা অন্তত রক্ষা করতে পারবে। বেশ খুসি হ'য়েই বাড়িটিতে গুছিয়ে বসলুম। দারজিলিং-এ আকাশ নীল, বাতাস ঠাণ্ডা, চারদিকে চোখের অফুরন্ত ভোজ; তা ছাড়া হাঁটাহাঁটিতে ও আবহাওয়ার গুণে আমার প্রচণ্ড খিদে হ'তে লাগলো; যা খাই তা-ই হজম হ'য়ে যায়। মনে-মনে ভাবলুম, এ-ভাবে চললে আমি নতুন মানুষ হয়ে কলকাতায় ফিরবো।

কিন্তু হায়, সুখ মরীচিকা মাত্র। আমার প্রথম ফুর্তির ধাক্কায় ভেবে দেখিনি, যে দারজিলিংএই আমি সব চেয়ে কম নিরাপদ। এখানে সকলেই দিনের বেশির ভাগ বাইরে কাটায়, সকলেই পায়ে হেঁটে বেড়ায়, এবং শহরটি অতিশয় ছোটো। কাজেই এবার পুজোর হিড়িকে যত লোক বেড়াতে এসেছে তাদের একজনের সঙ্গে অন্য সকলের বহুবার দেখা হওয়া অনিবার্য। আমার অবস্থা এখানে যে খুব সুখের হবে না সেটা বুঝতে পারলুম সেদিন সকালবেলায়—

ম্যাল্‌-এ একটা বেঞ্চিতে ব'সে আছি, মনটা বেশ খুসি। বাড়ি থেকে দুটো ডিম, একটা বড়ো পাঁউরুটির অর্দ্ধেকটা (সঙ্গে

মাখন ও জ্যাম) ও তিন পেয়ালা চা খেয়ে বেরিয়েছি, এখন মনে হচ্ছে একটু পরেই আবার বেশ খিদে পেয়ে যাবে। এতেও কার মন ভালো না হয়, বলো ? চুপচাপ ব'সে জঠরের অপূর্ব শূন্যতা উপভোগ করছি, এমন সময় বিলেতি পোষাক পরা একটি ছেলে আমার সামনে এসে নমস্কার ক'রে দাঁড়ালো।

'চিনতে পারছেন ?'

'না।' (বেশ রূঢ়স্বরেই)

'আজ্ঞে আপনিই তো সেই প্রসিদ্ধ লেখক—'

'আপনার কী দরকার ?'

'সেবার মার্চ মাসে আপনি শালকের মাভৈঃ লাইব্রেরির উদ্বোধন করেছিলেন—আমি সেখানে ছিলুম।'

'ও।'

'একবার আপনার পকেট থেকে রুমাল প'ড়ে গিয়েছিলো, আমিই তুলে দিয়েছিলুম।'

'ও।'

একটু চুপ।

এখানে কোথায় আছেন ?'

'হোটেল হিমালয়-এ।' ঝাড়া মিথ্যেটা বলতে একটু আটকালো মুখে, কিন্তু বললুম।

বিলেতি পোষাক পরা একটি ছেলে সামনে এসে দাঁড়ালো

'কদ্দিন আছেন ?'

'ঠিক নেই।' ব'লেই আমি উঠে পড়লুম, এবং ছেলেটির দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না ক'রে হনহন ক'রে এগিয়ে গেলুম যেদিকে চোখ গেলো।

এর পর দু'দিন আর ম্যালের রাস্তা মাড়াই নি। কেতাদুরস্ত পথঘাট ছেড়ে শহরের বাইরে নানা বিচিত্র পথে ঘুরে বেড়াই। কিন্তু মানুষ কি অদৃষ্টকে এড়াতে পারে ? একদিন জলাপাহাড়ের পথে একটা হাওয়া-ঘরে ব'সে তুষারশ্রেণীর সৌন্দর্যে মগ্ন হ'য়ে আছি, এমন সময় মস্ত একটা দলের মুখোমুখি প'ড়ে গেলুম—সেই ছেলেটি, আর-একজন ভদ্রলোক, দুটি মেয়ে ও দুটি বাচ্চা ছেলে। আমি তড়াক ক'রে উঠে নিচের দিকের একটা রাস্তা দিয়ে দৌড় দেবো ভাবছি, ছেলেটি ক্ষিপ্রগতিতে এসে আমার পথ জুড়ে দাঁড়ালো।

'এই যে, নমস্কার। আপনি এখনো আছেন তাহ'লে ?'

'আছি।'

'বেশ বাড়িটি পেয়েছেন সণ্ট হিল্‌ রোডে।'

আমি চুপ।

'ইনি আমার দাদা। এখানেই থাকেন, ডাক্তার।' ছেলেটি পরিচয় করিয়ে দেয়ামাত্র ভদ্রলোক এগিয়ে এসে একগাল হেসে

বল্লেন, 'আজ্ঞে আমার নাম রাজেন্দ্র রক্ষিত। আপনার দর্শন পেয়ে আজ ধন্য হলুম। আপনার বই কত যে পড়েছি! শুধু কি আমি? আমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে আপনার বই নিয়ে কাড়াকাড়ি থেকে মারামারি লেগেই আছে। আর ওদের মা —তিনিও আপনার বই পেলে তাঁর দাঁতের ব্যথা পর্যন্ত ভুলে যান। আপনার প্রত্যেকটি বই দু' কপি ক'রে না কিন্‌লে আমার চলে না। এই মঞ্জু, তিনু—তোরা আয়, এঁকে প্রণাম কর্।'

ভদ্রলোকের চার-চারটি অপত্য একে-একে আমাকে প্রণাম করলো; আমি মূর্তির মতো স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

তারপর রাজেনবাবু বললেন, 'যদি অভয় দেন তো একটি অনুরোধ জানাই। আমাদের এতই যখন সৌভাগ্য হ'লো যে আপনাকে কাছাকাছি পেলুম আপনি কি···আপনি কি একদিন দয়া ক'রে আমাদের ওখানে···বেশিক্ষণের জন্য নয়···আপনার পায়ের ধুলো পেলে আমরা সবাই ধন্য হবো।'

আমি আরম্ভ করলুম, 'আমার শরীর তো···'

'আজ্ঞে আপনার স্বাস্থ্য তো আমাদের পক্ষেও মূল্যবান। স্টেশনের কাছেই আমাদের বাড়ি; বেড়াতে তো বেরোন রোজই,

যদি দয়া ক'রে একদিন···যে-কোনোদিন আপনার সুবিধে, এই নরেন গিয়ে আপনাকে নিয়ে আসবে।'

জগতে ভদ্রতা ব'লে একটা জিনিস আছে ব'লে বলতে হ'লো, 'দেখি।'

এর পরে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে রোজ একবার ক'রে নরেনের আমার বাড়িতে আবির্ভাব হ'তে লাগলো। আমাকে না-নিয়ে গিয়ে সে কিছুতেই ছাড়বে না। রাজেনবাবু নিজেও দু'দিন এলেন। তখন আমার মনে হ'লো যে-না যাবার চেষ্টায় আমি যতটা সময় ও শক্তি নষ্ট করছি, তার চাইতে একদিন গিয়ে আপদ্ চুকিয়ে ফেলা সহজ। তাছাড়া, দারজিলিং-এর মতো জায়গায় বারোমাস থেকে সাহিত্য সম্বন্ধে এঁদের এত উৎসাহ—আমার সমস্ত বই দু' খানা ক'রে আছে—কিছুটা ভালোও লাগলো।

অগত্যা এক রবিবারের বিকেল চারটেয় নরেনের সঙ্গে তাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলুম। বসবার ঘরটি আমার আগমন উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে সাজানো। চায়ের বিরাট আয়োজন, এবং আমি এমনভাবে খেলুম যে আমার যে কখনো ডিস্‌পেপ্‌সিয়া ছিলো তা যেন ভুলেই গেছি। রাজেনবাবুর ছোটো মেয়েটি হার্মোনিয়ম বাজিয়ে এক বছরের পুরোনো

রেকর্ডের ছুটি গান করলো। রাজেন বাবু নিজে নানা রকম আলাপে ও ভদ্রতায় আমাকে আপ্যায়িত করলেন—ভদ্রলোকটিকে বেশ ভালোই লাগলো মোটর উপর।

তারপর আমি যখন উঠি-উঠি করছি, রাজেন্দ্রবাবু বললেন, 'ঐ আলমারিটায় আপনার বইগুলো, আপনি যদি দয়া ক'রে একবার······'

আমি বললুম, 'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। চলুন দেখি।'

ভদ্রলোকরা বইয়ের যত্ন নেন বটে। কাঁচের আলমারির পাল্লাগুলোয় কালো পরদা দেয়া, বাইরে ভারি তালা। তালা খোলা হ'লো, টানা হ'লো পাল্লা; দেখা গেলো সারি-সারি ঝক্‌ঝকে বই সাজানো···

একবার তাকিয়ে আমি আর দ্বিতীয়বার তাকাতে পারলুম না। তাড়াতাড়ি স'রে এসে একটা ইজি-চেয়ারে গা এলিয়ে দিলুম; হঠাৎ যেন আমার ব্লাড-প্রেশার বেড়ে গেলো।

বইগুলো সব **ঐ লোকটার।**

এদিকে রাজেনবাবু বলছেন, '···এই যে আপনার সব শেষের বইটি, "বিদ্যুল্লতা"। ওঃ, এটি যা হয়েছে!···এ কী! আপনার কি হঠাৎ অসুখ করলো?'

বইগুলো সব ঐ লোকটার!

আমি বল্‌লুম,'আজ্ঞে আপনারা ভুল করেছেন, আমার নাম জলদর্চি স্বাহা। ব-ফলাওয়ালা স্বাহা, মনে রাখবেন। ইংরেজিতে S-V-A-H-A। আমার পূর্বপুরুষরা অশিক্ষিত ছিলেন, নিজের নামের বানান জানতেন না।'

নরেন ফস ক'রে ব'লে উঠলো, 'বাঃ, দাদা, আমি তো তোমাকে বলেছি যে ইনি জলদর্চিবাবু, দিঙ্‌নাগবাবু নন। দিঙ্‌নাগবাবু তো এবার পণ্ডিচেরি গেছেন যোগের লেসন্স্‌ নিতে—দেখো নি কাগজে ?'

রাজেনবাবুর মুখ লাল হ'য়ে উঠলো ; তিনি আমতা-আমতা ক'রে কী কতগুলো বললেন বুঝতে পারলুম না। শোনবার ইচ্ছেও ছিলো না।

নরেনই আবার বললে, 'তা আপনার বইও আছে আমাদের বাড়িতে। ওরে মঞ্জু, "চিত্রগুপ্তের ডায়েরি"খানা নিয়ে আয় তো।'

'আজ্ঞে, ও-বইয়ের লেখক আমি নই। এবং আপনাদের বাড়িতে আমার বই নেই এ আমি খুব সুখের বিষয়ই মনে করি।'

'ভুল হ'য়ে গেছে, অপরাধ নেবেন না, বড্ড ভুল হ'য়ে গেছে……" রাজেনবাবুর করুন আর্তস্বর শুনতে পেলুম।

বাড়ি ফিরে এসেই আমার ভয়ানক বমি হ'ল। ও-বাড়িতে যা-কিছু খেয়েছিলুম, সব ; মায় পানটুকু সুদ্ধু। তারপর এলো জ্বর। জ্বর নিয়েই ফিরে এলুম কলকাতায়। সেই জ্বর থেকে একটা বিদ্‌ঘুটে শক্ত অসুখে দাঁড়ালো। মরতে-মরতে বেঁচে উঠলুম। কিন্তু মরলেই বুঝি ভালো ছিল !

সেদিন মংটুর বাড়ি গিয়ে দেখি, মংটু ওর গদি-আঁটা মস্ত ইজি-চেয়ারটায় কপালে হাত রেখে মড়ার মতো প'ড়ে আছে, আর ওর সামনে পিঠ-খাড়া চেয়ারে ব'সে কে একজন ঘ্যাঙোর-ঘ্যাঙোর ক'রে কথা ব'লে যাচ্ছে। তার পরনে সায়েবদের মতো গরম কাপড়ের পেন্টেলুন, পায়ে কিরিকিরি-নক্সা-কাটা মোজা আর বাচ্চাদের শোবার তেলতেলে কাপড়ের মতো চক্‌চকে কালো জুতো, গায়ে রোঁয়া-রোঁয়া শেয়াল-রঙের কোট, গলায় গোল-গোল উল্কি-আঁকা নেক্‌টাই আর কুত্তার বখলষের মতো শক্ত শাদা কলার—কোটের পকেটে দুটো ফাউণ্টেন পেনের ক্লিপ ঝক্‌ঝক্ করছে, আর টেড়ির কী বাহার, যেন মাথার মধ্যে দিয়ে চৌরঙ্গি চ'লে গেছে। ঘরে ঢুকেই আমি থ। প্রায় পালাচ্ছিলুম, মংটু কেমন কাঁদো-কাঁদো গলায় ডাকলে—'এই নবা, শোন।' আর আমার নাম শুনেই সেই লোকটি আমার দিকে তাকালো, আর তক্ষুনি আমি মনে-মনে বললুম, গেছি রে ভাই।

—'এই যে নবা, এসো। কেমন আছো? কী খবর?'

হায় হায়, এতদিন পরে আবার বুঝি ভ্যাণ্টার খপ্পরে পড়লুম! ওকে এড়াবার জন্য সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে কি আগুনে

লাফিয়ে পড়া কিছুই নয়, আমরা তো শুধু রংপুর থেকে কলকাতায় পালিয়েছি। তখনই বোঝা উচিত ছিলো এত সহজে ওর হাত থেকে রেহাই নেই। ঠিক এসেছে কলকাতায়, ঠিক খুঁজে বা'র করেছে আমাদের আড্ডা। ওর পাল্লায় একবার পড়লে আর কি রক্ষে আছে! ছিনে জোঁকের মতো লেগে থাকবে, পায়ে ধ'রে কাঁদলেও ছাড়বে না। রংপুরে সাত জন

জোয়ানকে ও পাগল ক'রে ছেড়েছে, তারা এখন রাঁচির হাসপাতালে যেখানে আর-কেউ থাকে না এমন ঘরে একা-একা মহাসুখে আছে, কোনো মানুষ কাছে এলেই খেঁকিয়ে ওঠে ; আর এক ভদ্রলোকের বাড়িতে ভ্যাণ্টা রোজ সকালে গিয়ে দু'ঘণ্টা কাটাতো, তিনি হঠাৎ একদিন জানলা দিয়ে দেখলেন ভ্যাণ্টা আসছে, যেই না দেখা, হার্টফেল ক'রে ম'রে গেলেন তক্ষুনি। আড়চোখে মংটুর দিকে একবার তাকিয়ে দেখলুম তার মুখ ফ্যাকাশে, চুল উসকোখুসকো, জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে বার-বার, যে-কোনো তাজা জ্যান্ত টগবগে মানুষকে আধ-মরা ক'রে আনতে ভ্যাণ্টার ঘণ্টাখানেকের বেশি লাগে না।

ভ্যাণ্টা খুব বন্ধুভাবে আমার পিঠে এক চাপড় দিয়ে আবার বললে, 'ভালো তো ?'

আমি আমার চেয়ারটা একটু সরিয়ে নিয়ে বললুম, 'কবে এলে কলকাতায় ?'

—'এই তো কাল মোটে। মংটু কোথায় থাকে জানতুম না তো, হঠাৎ আজ ট্র্যামে দেখা। (এখানে মংটুর দীর্ঘশ্বাস শোনা গেলো।) মংটু তো আমাকে চিনতেই পারেনি— আমার পরনে এই এ-সব কি না—তা ভাই এ-সব ধড়াচূড়া পরতে কি আর ভালো লাগে, তবে আমাদের প্রোফেশনে

এ সব না-হ'লেও চলে না। এই তুর্দিনে এ-সব কাপড়-চোপড় করাতে দেখো তু'শো টাকা বেরিয়ে গেলো—তা যা-ই বলো ভাই, এ-সব পরলে ভারি স্মার্ট লাগে—'

ব'লে ভ্যাণ্টা এমন ভাবে আমার দিকে তাকালো যেন আমি একটা প্রকাণ্ড আয়না। শীতকাল, ঘাম নেই, তবু খামকা একবার পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বা'র ক'রে মুখ মুছে বল্‌লে—'হ্যাঁ, মংটু আমার পাশ দিয়েই নেমে যাচ্ছিলো, আমি ওর জামার কোণ চেপে ধরলুম—(আবার মংটুর দীর্ঘশ্বাস) ও তবু খেয়াল না-ক'রে জামা ছাড়িয়ে নিয়ে গেলো, সঙ্গে-সঙ্গে আমিও চলতি ট্র্যাম থেকে লাফিয়ে পড়লুম। হ্যাঃ-হ্যাঃ।'

ভ্যাণ্টা ঘোড়ার মতো হেসে উঠলো, আর মংটু এবার ঠিক ডেঙ্গু রোগীর মতো ক্যাঁ-কোঁ ক'রে উঠলো।

—'যাচ্ছিলুম কাজে, কিন্তু বন্ধু-বান্ধব দেখলে আমি সব কাজ ভুলে যাই, ঐ আমার একটা মস্ত উইকনেস্।'

আমিও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্‌লুম—'কদ্দিন আছো কলকাতায়?'

—'কদ্দিন? একটা সুখবর দিচ্ছি, শোনো, এখন থেকে আমি কলকাতাতেই থাকবো।'

বন্ধুবৎসল ভ্যান্টা

—'বলো কী—থাকবে ?'

—'হ্যাঁ, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি ? এখানেই প্র্যাকটিস করবো, অজ মফঃস্বলে কিছু হবে না। ধরমতলায় চেম্বর নেবো— তোমাদের খুব সুবিধেই হ'লো, একজন বিনি পয়সার ডাক্তার পেলে। আরে না—না—তোমরা আবার টাকা দেবে কী—যক্ষুনি দরকার হয় ডাকবে। আমি তো আছিই— ভয় কী ?'

ওর থাকাটাই যে ভয়ের কারণ সে-কথা ওকে কেমন ক'রে বোঝাই, মনে-মনে ভাবছি, এমন সময় ও আবার বললে, (আর কেউ কিছু না-বল্‌লেও একা-একা কথা ব'লে যাবার ক্ষমতা ওর আশ্চর্য), 'এখানে তোমরা কোথায় বাড়ি নিয়েছো ?'

—'এই তো কাছেই।'

—'সাদার্ন এভিনিউতেই ?'

আমি কিছু বলবার আগেই মংটু তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলো —'নবার ঠিকানা হ'লো পি ২১৭ সাদার্ন্‌ এভিনিউ, দোতলার ফ্ল্যাট।'

আমি বিষের মতো চোখে মংটুর দিকে একবার তাকালুম; কিন্তু ও উদাসীনভাবে মুখ ঘুরিয়ে রইলো।

ভ্যাণ্টা বল্‌লে—'তা হ'লে তো আজই একবার যাওয়া যায় তোমাদের বাড়ি।'

আমি শুধু একবার ঢোঁক গিললুম।

—'তুমি এখানে কতক্ষণ আছো ?'

—'আছি খানিকক্ষণ, তার পর একবার যেতে হবে শ্যাম-বাজার, সেখান থেকে শেয়ালদা স্টেশনে আমার মামিমাকে ঢাকা মেলে তুলে দিয়ে তবে বাড়ি ফিরবো।

—'তা তোমাদের বাড়ির আর সবাই তো আছে—বিলু, বেণু, শম্ভু, কুটকুট—আর মাসিমা—'

মংটু হঠাৎ উৎসাহিতভাবে ব'লে উঠলো—'হ্যাঁ, সবাই আছে। এ-সময়ে ওরা সকলেই বাড়ি থাকে—অন্তত কেউ-না-কেউ থাকেই।'

মংটুর ভাবখানা এইরকম মনে হ'লো যেন ওর মৃতদেহে প্রাণ ফিরে আসছে।

ভ্যাণ্টা একবার ওর সোনার হাত-ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বল্‌লে—'থাক্, আজ আর না গেলাম। আটটায় আবার ডক্টর বোসের সঙ্গে একটা এনগেজমেণ্ট করেছি—তিনি আর আমি আমি একসঙ্গে চেম্বর নিচ্ছি কিনা।'

আমি আর মংটু চট্ ক'রে একসঙ্গে বড়ো দেয়াল-ঘড়ির

দিকে তাকালুম—বাব্বাঃ, আটটা বাজতে এখনো সওয়া ঘণ্টা দেরি!

ভ্যাণ্টা তার ড্যাবডেবে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললে, 'নবা, আজ আর তা হ'লে তোমাদের বাড়ি না গেলুম, এনগেজমেণ্টটা বড্ড জরুরি। কিছু মনে কোরো না ভাই। মাসিমা না জানি কত রাগ করবেন আমার উপর—এত কাছে এসেও তাঁর সঙ্গে দেখা করলুন না। তা আমি যাবো নিশ্চয়ই—কালই যাবো—মাসিমাকে বলো তিনি যেন রাগ না করেন, কেমন ?'

আমি বললুম—'আরে না, না, পাগল নাকি! আমরা কেউ কিছু মনে করবো না, মা একটুও রাগ করবেন না—তুমি তো এখন কতই ব্যস্ত থাকবে, কাজকর্মের হিড়িকে যদি আমাদের বাড়ি একবারও যেতে না পারো তা হ'লেও আমরা কেউ একটুও রাগবো না, আমার এই একটা কথা তুমি বিশ্বাস করতে পারো।'

আমার কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই ভ্যাণ্টা ব'লে উঠলো—'কী যে বলো তুমি! আমার হাজার কাজ থাকলেও বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে দেখা না ক'রে কি পারি! জানো তো ভাই, আমার জীবনে আমার ঐ একটিই উইকনেস, বন্ধু-বান্ধব দেখলে আমি আর স্থির থাকতে পারিনে। আর এতে আমার ক্ষতিই কি

হয়েছে কম! সে রকম মন দিলে হাজার-হাজার টাকা রোজগার করতে পারতুম—কিন্তু কাজে তো আমার মন বসে না, কোথায় কোন্ চেনা লোক আছে খুঁজে-খুঁজে বেড়াই, অচেনা লোকের সঙ্গে যতক্ষণ না আলাপ হয় ছটফট করি। জানো তো তোমরা আমার স্বভাব—।'

আমি দাঁতে দাঁত চেপে বল্‌লুম, 'তা জানি।'

—'আচ্ছা, কালই যাবো তোমাদের বাড়ি—কথা রইলো। কোন্ সময়ে বাড়ি থাকো তুমি?'

আমি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলুম—'সারাটা দিন তো আপিসেই কাটে, আর সন্ধেবেলা এখানেই আসি রোজ।'

—'রোজই আসো? বাঃ বেশ আড্ডাটি জমেছে তোমাদের। ভালোই হ'লো।'

—'নবাকে সকালবেলায় বাড়ি পাওয়া যায় ন'টা পর্যন্ত', মংটু হঠাৎ বল্‌লে। 'আর বিকেলের দিকেও পাঁচটার পরে তো বাড়িতেই থাকো, থাকো না, নবা?'

মংটুর এই মিনিমুখো ভালোমানষি দেখে শরীরটা রাগে জ্ব'লে গেলো। ভ্যাণ্টা বল্‌লে—'যদি পারি কাল সকালেই যাবো তোমাদের ওখানে।' আর তার পর ও পুরো এক ঘণ্টা অবিশ্রান্ত বকরবকর করলে—উঠলো যখন, আটটা বাজতে

দশ মিনিট বাকি। ততক্ষণে আমাদের হ'য়ে এসেছে। ও চ'লে যাওয়া মাত্র মংটু একবার 'উঃ' ব'লে ইজিচেয়ারে একেবারে এলিয়ে পড়লো, আর আমার মনে হলো ডুকরে কেঁদে উঠলে হয়তো এ-যন্ত্রণার কিছু শান্তি হয়।

পরদিন সকাল থেকে ভয়ে-ভয়ে আছি—কখন ভ্যাণ্টা এসে পড়ে। জানলার ধারে দাঁড়াতে সাহস হয় না, সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনলেই বুকটা ধড়াস ক'রে ওঠে। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে চুপচাপ কাটালুম, তার পর সাড়ে-আটটা বাজতেই মাথায় দু' ঘটি জল ঢেলে, দু' গরস ভাত মুখে পুরে ভোঁ দৌড় আপিসের দিকে। জীবনে যা কখনো হয়নি—আধ ঘণ্টা আগেই আপিসে হাজির হলুম—আমাকে দেখে দরওয়ান পর্যন্ত অবাক।

শীতকালে বাড়ি ফিরতে-ফিরতেই সন্ধে। কাপড়-চোপড় ছেড়ে বিছানায় একদম লম্বা, এক্ষুনি চা আসবে, শুয়ে-শুয়েই সেটা পেটে চালান করবো—সময়টা যে কত আরামের তা তোমরা যখন বড়ো হ'য়ে আপিস যাবে তখন বুঝবে। এমন সময় হঠাৎ পাশের ঘরে শুনি—এ কী! ভ্যাণ্টার গলার আওয়াজ

না? বুকটা টিপটিপ করতে লাগলো, তিড়িং ক'রে উঠে আলোটা নিবিয়ে দিয়েই আবার কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম। সঙ্গে-সঙ্গে শুনি শম্ভুটা আমার দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে বল্ছে—'এই যে, ন'দা এ-ঘরে আছেন।'

ন'দা আছেন! বটেই তো! দাঁড়া না, তোকে মজা দেখাচ্ছি।

আমি গলা মোটা ক'রে ডাকলুম—'শম্ভু!'

কোথায় শম্ভু! ভ্যাণ্টা ঘরে ঢুকে বল্লে, 'শম্ভু তো এইমাত্র বেরিয়ে গেলো। তুমি এই অসময়ে শুয়ে যে?'

ওরা বেশ চালাক কিন্তু, চট্ ক'রে সটকেছে সব। এইমাত্র শুনছিলুম পাশের ঘরে দারুণ হল্লা, এখন সমস্ত বাড়ি চুপচাপ, যেন কেউ নেই। ধরা প'ড়ে গেলুম আমি। আবার বলা হচ্ছিল ন'দা এ-ঘরে আছেন। পাজি, ছুঁচো, গণ্ডার।

—'কী হে, শুয়ে আছো যে?'

আমি সংক্ষেপে বললুম, 'শুয়ে আছি।'

—'এই সময়ে শুয়ে আছো! উৎসাহ নেই, উত্তম নেই, কী যে হয়েছো তোমরা! আমাকে ত্যাখো তো! সকাল থেকে এগারোটি বাড়িতে দেখা করেছি, জানো? তাই তো তোমাদের এখানে আসতে-আসতে সন্ধে হ'য়ে গেলো। সকালে

আসিনি ব'লে রাগ করোনি তো? শোভনদের বাড়ি গিয়েছিলুম, কিছুতেই ছাড়লে না, দেরি হ'য়ে গেলো।'

শোভনের কথা ভেবে কিছু সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করলুম, সান্ত্বনা পেলুম না।

চাকর চা নিয়ে এলো। চা আমার এত প্রিয়, কিন্তু ভ্যাণ্টার বিরামহীন বক্‌বকনি শুনতে-শুনতে মনে হচ্ছিলো যে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ঠিকই বলেন, চা-পান আর বিষপান সমান কথা।

চায়ের পরে ভ্যাণ্টা বল্‌লে—'আজ যাবে না মংটুর ওখানে?'

আমি তাড়াতাড়ি বল্‌লুম—'আমি একটু পরে যাচ্ছি, তুমি যাও।'

—'চলো এক সঙ্গেই যাই। আর কে-কে আসে এখানে?'

—'ওঃ, অনেকেই আসে। তুমি যাও না, অনেক চেনা লোক পাবে। আমি এই হাত-মুখ ধুয়েই চ'লে আসছি।'

—'আচ্ছা, আমি না-হয় একটু বসছি।'

আমি করুণ সুরে বললুম—'তুমি আগেই যাও না। মংটু কাল কত খুসি হ'লো তোমাকে দেখে।'

ভ্যাণ্টা একগাল হেসে বল্‌লে—'হ্যাঁ, আমাকে দেখে সবাই খুসি হয়, কেন বলো তো? বাস্তবিক, কেন যে তোমরা

আমাকে এত ভালোবাসো ভেবেই পাইনে। শুধু তোমরাই নয়, যেখানেই যাই, যার সঙ্গেই দেখা হয়, আমাকে একবার পেলে আর ছাড়তে চায় না।'

—'যা বলেছো! তুমি তাহ'লে এগোও,' বলতে-বলতে আমি বিছানা ছেড়ে উঠে দরজার ধারে দাঁড়ালুম। 'আমি এই পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আসছি।'

—'মাসিমার সঙ্গে তো—'

—'মা বাড়ি নেই, সিনেমা দেখতে গেছেন। তুমি শিগ্‌গির যাও, মংটু আবার বেরিয়ে না যায়।' এক রকম জোর ক'রে ঠেলে-ঠুলেই দরজার বাইরে নিয়ে সিঁড়ি পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিলুম ওকে। তারপর এক দৌড়ে বাথ-রুমে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে অষ্টমীর পাঁঠার মতো কাঁপতে লাগলুম।

পাঞ্জাবির উপর আলোয়ান জড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছি, আরশিতে আর-একজনের ছায়া পড়লো। চমকে পিছনে তাকিয়ে দেখি, মংটু।

—'এ কী করেছো তুমি!' আমার সঙ্গে চোখাচোখি হ'তেই সে ব'লে উঠলো। 'এতদিনের বন্ধুতার এই কি প্রতিদান?'

আমি গম্ভীরভাবে বল্‌লুম, 'চাচা, আপন বাঁচা। তারপর, তুমি পালালে কেমন ক'রে?'

বন্ধুবৎসল ভ্যাণ্টা

—'একটা টেলিফোন করতে হবে, এই অছিলায় বেরিয়ে এসেছি। ও ব'সেই আছে। তুমি কোথায় বেরুচ্ছো?'

—'তোমার ওখানে নয়।'

—'আমিও যাবো তোমার সঙ্গে।'

—'কোথায়?'

—'যেখানে হয়।'

কিন্তু কোথায়ই বা যাওয়া যায়? শীতকালে পার্কে বসা যায় না, সিনেমা আরম্ভ হ'য়ে গেছে, মিছিমিছি রাস্তায়ই বা কতক্ষণ ঘুরে বেড়ান যায়? দু'জনে চুপ ক'রে ব'সে ভাবতে লাগলুম।

হঠাৎ মংটু ব'লে উঠলো—'এক কাজ করি না। এখানেই বসি।'

—'তারপর?'

—'ও আমার ওখানে ব'সে থেকে-থেকে চ'লে যাবে—আর কী হবে?'

—'ওকে তুমি তাহ'লে চেনো না। ঠিক টের পাবে। এখানে এসেই হাজির হবে আবার।'

—'তবে উপায়?'

—'তোমার তো এ-সব বিষয়ে খুব মাথা খোলে। একটা বুদ্ধি বাৎলাও।'

দু'জনে চুপচাপ ব'সে অনেক ভাবলুম, কোনো বুদ্ধিই মাথায় এলো না। অগত্যা মংটু বল্‌লে, 'চলো না-হয় খানিকক্ষণ ট্র্যামেই ঘুরে আসি—দু'জনেরই তো মন্থ্‌লি টিকিট আছে। তবু অন্য কথাবার্তা ব'লে মনটা ভালো হবে। আশা করি আমার এই দুর্ব্যবহারের পর ও আর আসবে না।'

—'পাগল হয়েছো তুমি! ও কিছুই মনে করবে না এতে—কাল আবার আসবে, পরশুও আসবে, রোজই আসবে, দেখো না মজা!'

আমার কথা শেষ হ'তে-না-হ'তেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেলো। মংটুর সঙ্গে আমার চকিতে একবার চোখো-চোখি হ'য়ে গেলো, তারপর দু'জনেই এক লাফে ঘরের বাইরে। সিঁড়ির দরজার একটা কপাটের আড়ালে দাঁড়ালুম আমি, আর-একটার পিছনে মংটু কোনোরকমে লুকোলো। একটু পরেই ভ্যাণ্টা দরজা দিয়ে ঢুকলো। আমার ঘরে উঁকি মেরে বল্‌লে—'এ কী! কোথায় গেল সব? নবা! নবা!'

আমি আর মংটু একসঙ্গে সিঁড়ির দিকে ছুটলুম, দু' জনের মাথাটা একবার ঠুকে গেলো। দৌড়িয়ে নেমে আসতে-আসতে টের পেলুম, ভ্যাণ্টা পিছনে ধাওয়া করেছে। ফুটপাথে এসে নামতেই ও আমাদের ধ'রে ফেললো; এক হাত মংটুর, আর-

বন্ধুবৎসল ভ্যাণ্টা

এক হাত আমার কাঁধে রেখে বত্রিশ পাটি দাঁত বার ক'রে হেসে বল্‌লে—'কোথায় যাচ্ছিলে তোমরা ভাই? ওঃ, ভাগ্যিস তোমাদের ধ'রে ফেলেছি। মংটু, তোমার টেলিফোন করা হয়েছে? একা ব'সে-ব'সে ভালো লাগছিলো না,—ভাবলুম আর-একবার নবারই খোঁজ করি। চলো, কোন্ দিকে যাচ্ছিলে, চলো।'

আমরা দু' জনে তখনো হাঁপাচ্ছিলুম; তা ছাড়া মনের অবস্থাও এমন যে মুখে একটা কথা ফুটলো না।

—'চলো, মংটু, তোমার বাড়িই যাওয়া যাক্। আমার আর বেশি দেরি করা উচিত নয়, সাতটার সময় তুষারবাবুদের বাড়ি যাওয়ার কথা—তা একটু দেরি হ'য়ে যাবে—কী আর করা? আমার স্বভাবই ঐ—বন্ধুবান্ধবের জন্য সর্বস্ব ছাড়তে পারি। তুষারবাবুরা নিশ্চয়ই রাগ করবেন—কিন্তু আমি তোমাদের ঘাড়েই দোষ চাপাবো, তা কিন্তু ব'লে দিলাম। বলবো, মংটু, নবা ওরা কিছুতেই ছাড়লে না—জোর ক'রে ধ'রে রাখলে।'

ভ্যাণ্টা কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে দু' হাতে আমাদের দু' জনের হাত চেপে ধরলো তারপর টেনে নিয়ে চললো মংটুর বাড়ির দিকে।

পুরোনো বালিগঞ্জ পাড়ায় পুরোনো একটা বাড়ি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলাম। বাবার দূরদৃষ্টি ছিলো ; পঞ্চাশ বছর আগে যেখানে সন্ধের আগেই শেয়াল ডাকতো সেখানে জলের দরে জমি কিনে একটি বাগানবাড়ি তৈরি ক'রে রেখেছিলেন। আজ সেই শেয়াল-সঙ্কুল গ্রাম কলকাতার সব চেয়ে ফ্যাশনেবল পাড়ায় রূপান্তরিত ; আর বাড়িটি যদিও সেকেলে ধরণের, তবু বাগানকে টেনিস-লনে পরিণত ক'রে, আর গোটা চারেক বিলিতি বাথরুম বসিয়ে মাসে শ' চারেক টাকা ভাড়া অনায়াসে পাওয়া যাচ্ছিলো।

শেষ ভাড়াটে ছিলো এক আধা-বুড়ো সায়েব। দীর্ঘ তিরিশ বছর ধ'রে অসহায় ভারতবাসীর রক্ষণাবেক্ষণ করবার পর একদিন তাঁর সময় এলো তল্পিতল্পা গুটিয়ে স্বদেশে ফেরবার। এক মাস আগে যথারীতি নোটিশ পাওয়া গেলো।

লেগে গেলুম অন্য ভাড়াটের তল্লাসে। কাগজে বিজ্ঞাপন দেয়া হ'লো, চেনাশোনা বন্ধুমহলেও খোঁজখবর নিতে লাগলুম। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি নতুন ভাড়াটে খুঁজে বের করবার গরজের আরো একটু কারণ আমার ছিলো ; কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে চ'লে যেতে হচ্ছে হয়দ্রাবাদে, বছরখানেকের মধ্যে ফেরা

হবে না। যাবার আগে বাড়িটার একটা ব্যবস্থা করাই দরকার।

বাড়িটা অনেকেই দেখতে এলেন, কিন্তু সকলেই ফিরে গেলেন। বড্ড নাকি 'ওল্ড্-ফ্যাশণ্ড্' আমার বাড়ি। আয়তন আছে বটে, আরাম নেই। নিরুপায় হ'য়ে চড়া দামের জায়গা নিয়ে বিজ্ঞাপন চালালুম, ভাড়াটে চাই-ই।

গমনোদ্যত সায়েবটির জন্য ভারি মন-খারাপ লাগলো। বাড়িটায় দশ বছর ছিলো লোকটা, আর আমিও দিব্যি নিশ্চিন্ত ছিলুম; অবিলম্বে যে ভারতের প্রতি তার কর্তব্য শেষ হবে সে-কথা মনেই হয়নি। একদিন গেলুম সায়েবের কাছে বিদায় দিতে। আমাকে দেখে হাতে ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে বসালেন; তারপর উপস্থিত গ্রীষ্মাধিক্য সম্বন্ধে দু' একটা মন্তব্য-বিনিময়ের পর কাজের কথা পাড়লুম।

—'ছাখো, সায়েব, তুমি তো ঠাণ্ডা দেশে পালিয়ে বাঁচবে, তার আগে তোমার মতো আর একটি ভাড়াটে যদি জুটিয়ে দিতে পারো বড়ো উপকার হয়।'

সায়েব বললেন, 'দেখবো আমার বন্ধুদের ব'লে। কিন্তু জানো কী, সোম, আমি সেকেলে বুড়োমানুষ, আমার এখানে একরকম কেটে গেছে, কিন্তু আজকালকার ছোকরাদের পছন্দ

অন্য রকম। কম ভাড়ার ব্রাইট লিট্‌ল্ ফ্ল্যাটের উপরেই ওদের নজর। আমার অনেক বন্ধুই এখানে এসে বলে—হোয়াট্ এ গ্রুমি ওল্‌ড্ প্লেস্! বাড়িটা ভেঙে আবার যদি তৈরি করতে পারো—'

'আমি বল্‌লুম, 'তা পারলে তো কথাই ছিলো না।'

সায়েব বললেন, 'গ্যাখো, একটা কথা। আমার ফার্নিচার সব বেচে দিচ্ছি, তুমি কিনবে? লট্-এ নিলে শস্তা পড়বে খুব।'

'আমি তো হয়দ্রাবাদে চলে যাচ্ছি সামনের মাসে।'

'সে তো আরো ভালো। ব্যাপারটা কী-রকম হবে জানো? তোমার বাড়ি যে-রকম সাজানো-গুছোনো দেখছো তাই থাকবে, রেফ্রিজরেটর, রেডিও, গ্রামোফোন, বইপত্তর সব সুদ্ধ। এ-রকম একটি ফার্নিশ্‌ড্ বাংলো পেলে অনেকেই লুফে নেবে, ভাড়াও তুমি টেন্ পর্সেণ্ট বাড়িয়ে দিতে পারবে অনায়াসে। কী বলো?'

সায়েবের কথাটা নেহাৎ মন্দ লাগলো না। সত্যি, একেবারে সাজানো-গুছোনো বাড়ি পেলে এর সেকেলেত্ব সত্ত্বেও ভালো ভাড়াটে জোটা হয়তো সম্ভব। মনের ভাব চেপে গিয়ে বললুম, 'কিন্তু টাকাও তো কম ফেলতে হবে না।'

'কিচ্ছু না, কিচ্ছু না, ফর এ সং পেয়ে যাবে সব। আমার

সব জিনিস ল্যাজারসের তৈরি, ইচ্ছে করলে তুমি খোঁজ নিতে পারো। সব মিলে পঞ্চাশ হাজার টাকার মাল আমার ঘরে আছে ; ক্যাশ ডাউন দশ হাজারে দিয়ে দিচ্ছি—এর চেয়ে শস্তা কী আর হ'তে পারে! ভাড়া যা বেশি পাবে তাতে এ টাকা উঠে আসতে চার বছরও তোমার লাগবে না। আর তার পরে ব'সে-ব'সে মাসে-মাসে মুনফা টানবে। কিছু ভেবো না, প্রত্যেকটি জিনিস এমনি টেঁকসই যে এক জীবন এরা স্বচ্ছন্দে টি কবে। রাজি ?'

আমি বল্লুম, 'আচ্ছা, ভেবে দেখি।'

'চলো, তোমাকে জিনিসগুলো একবার দেখিয়ে আনি। দেখলেই বুঝবে, এ একটা বার্গেন বটে!'

দেখলুম সব আসবাব। এন্তার জিনিস, সত্যি মূল্যবান, একটি ধনী পরিবাবের যা-কিছু দরকার হ'তে পারে, কিচ্ছু বাদ নেই। 'চারশো গ্রামোফোনের রেকর্ড আর ১০৮৭ খানা বই ফাউ দিয়ে দিচ্ছি', সায়েব বললেন। 'তুমি সব একসঙ্গে কিনে নিলে আমার হাঙ্গামা বেঁচে যায়, আর তোমার আয়ের পথ খোলসা হয়। এমন কি, তুমি যদি জিনিসগুলো একটা-একটা ক'রে ফের বিক্রি করো তা হ'লে ক্লীন ফিফ্‌টি পর্সেণ্ট লাভ অনায়াসেই থাকবে।'

রাজি হ'য়ে গেলুম। চ'লে আসবার আগে সায়েব আর-একবার হাত-ঝাঁকুনি দিলেন, তাছাড়া আমার হাতে শেষ মাসের ভাড়া বাবদ চেক্‌টিও তুলে দিতে ভুললেন না। দু' দিন পরে দশ হাজার টাকার (একটি পয়সাও কমানো গেলো না) একটি চেক্-এর বিনিময়ে টমাস টেলর সায়েবের যাবতীয় আসবাবপত্র হ'লো আমার। পরের দিনই 'কমপ্লীট্‌লি ফার্নিশড্' বাংলোর বিজ্ঞাপন বেরুলো কাগজে।

বলতে সুখী হচ্ছি, প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ভাড়াটে জুটলো।

প্রকাণ্ড গাড়ি হাঁকিয়ে ভদ্রলোক নিজেই আমার ঠিকানায় এসে উপস্থিত। আমার সঙ্গে দেখা হ'তেই বললেন, 'আপনার একটা বাড়ি খালি আছে মে-ফেয়ারে?'

আমি বললুম, 'আছে। আপনি…'

কিন্তু আমার কথা শেষ না-হ'তেই তিনি আবার বললেন, 'বাড়িটা একবার দেখা যায়?'

'তিরিশ তারিখে খালি হবে। তখন দেখবেন।'

ভদ্রলোক একটা অধৈর্যসূচক শব্দ ক'রে বললেন, 'তিরিশে! আচ্ছা, তিরিশে সকালেই আমি দেখতে চাই।'

'আসবেন সকালবেলায়।'

'বাড়ি পছন্দ হ'লে আমি এক্ষুনি নেবো—বেশিদিনের জন্যেই

নেবো—আর-কাউকে কথা দিয়ে ফেলবেন না যেন। বুঝলেন? আমার নাম বল্লভ চৌধুরী, রূপডাঙার রাজা।'

'সেটা কোথায়?'

'বাঃ, রূপডাঙার নাম শোনেন নি? বর্ধমানের রাজার নাম শুনেছেন আশা করি? আমাদের আর ওঁদের পাশাপাশি জমিদারি।...আচ্ছা, উঠি আজকে।' প্রকাণ্ড লম্বা কোঁচা সামলে ভদ্রলোক যে কী ক'রে হেঁটে গিয়ে গাড়িতে উঠলেন, অবাক হ'য়ে তাকিয়ে দেখলুম। প্রায় একটা সার্কাসের কসরৎ! হ্যাঁ, জমিদারবাবু বটে!

ইতিমধ্যে আরো দু'-একটা খোঁজ-খবর এলো, টেলর সায়েব বম্বে মেল্-এ চাপলেন, আর তিরিশ তারিখ সকাল ঠিক সাড়ে-আটটায় আর-একখানা জমকালো গাড়ি নিয়ে বল্লভ বাবু এলেন। নিয়ে গেলুম তাঁকে বাড়ি দেখাতে, এবং বাড়িখানা তাঁর পছন্দই হ'লো। আসবাবগুলোর প্রতি ঈষৎ তাচ্ছিল্যের একটা দৃষ্টিপাত ক'রে বললেন, 'মন্দ নয় একরকম, কাজ চ'লে যাবে। তা ভাড়া?'

আমি সাহস ক'রে বল্‌লুম, 'পাঁচশো, আর দু' বছরের গ্যারান্টি।'

'পাঁচশো...হুঁ...'

আমি বললুম, 'আপনি বলেছিলেন ব'লে আর কারো সঙ্গে কথাও বলি নি।'

'আচ্ছা, গ্যারান্টি দিচ্ছি ছু' বছরের, সাড়ে-চারশো ক'রে দিন।'

বেশি টানতে গেলে পাছে ছিঁড়ে যায় সেই ভয়ে আর-কোনো কথা বললুম না। তক্ষুনি আমার বাড়িতে ফিরে এসে কাগজ-পত্র সই করা হ'লো। তারপর বল্লভবাবু বললেন, 'দেখুন, একটা কথা। ভাড়া আপনাকে আমি ছ' মাসের আগাম দিয়ে দিচ্ছি। ও-সব মাসে-মাসে ভাড়া-ফাড়া দেয়ার হাঙ্গামা আমার পোষায় না—বুঝলেন না, আই ডোণ্ট্ ওয়াণ্ট্ টু বি বদার্ড। আপনাকে কিচ্ছু করতে হবে না, ছ' মাস পরে আমি আবার ছ' মাসের ভাড়া পাঠিয়ে দেব।'

মনে-মনে দারুণ উল্লসিত হলুম, কিন্তু মনের ভাব বাইরে প্রকাশ না-করবার চেষ্টা ক'রে বললুম, 'বেশ তো। এ-ব্যবস্থায় আমার সুবিধেই হ'লো, কারণ কয়েক দিনের মধ্যেই আমি চ'লে যাচ্ছি হয়দ্রাবাদ।'

'ও, তাই নাকি? কদ্দিন থাকবেন সেখানে?'

'বছরখানেক তো বটেই।'

'তা আর কী হয়েছে—কিচ্ছু ভাববেন না। আপনার

বাড়ির যত্ন আমি নিজের বাড়ির মতোই নেবো। এখানে আপনার গোমস্তা-টোমস্তা কেউ আছে নাকি ?'

'এখনো তো কাউকে ঠিক করিনি।'

'আমি বলি কী, মশাই, মিছিমিছি একটা লোককে মাইনে দেবেন কেন ? ভাড়া তো আপনি আগামই পেয়ে যাচ্ছেন,' ব'লে ভদ্রলোক পকেট থেকে চেক্-বই বার ক'রে সাতাশ শ' টাকার একটি চেক্ আমার নামে লিখে দিলেন। আমার মৃদু-উচ্চারিত ধন্যবাদ অগ্রাহ্য ক'রে বল্‌লেন, 'জুন থেকে নবেম্বর পর্য্যন্ত দেয়া হ'য়ে গেলো। ডিসেম্বরের—এই দোসরার মধ্যে পরের ছ' মাসের ভাড়া আপনার কাছে পৌঁছে যাবে—যদি না যায়, তাহ'লে দয়া ক'রে একখানা পোস্টকার্ড ছেড়ে দিলেই—বোঝেন তো, ব্যস্ত মানুষ, হয়তো মনে থাকলো না।'

ভদ্রলোকের অমায়িকতায় ও উদারতায় আমি ততক্ষণে প্রায় বিহ্বল। ভালো ক'রে কোনো কথাই বলতে পারলুম না। আরো ছু'-চার কথার পরে বল্লভবাবু আমার হয়দ্রাবাদের ঠিকানাটা টুকে নিয়ে বিদায় নিলেন।

আমি যেন হাতে স্বর্গ পেলুম। এমন চমৎকার ভাড়াটে, আর তাও ছ' মাসের আগাম ভাড়া—টাকাগুলো কলকাতা

ছাড়বার মুখে খুবই কাজে লাগবে। অত্যন্ত নিশ্চিন্ত, প্রফুল্ল ও হাল্‌কা মন নিয়ে হয়দ্রাবাদ যাত্রা করলুম।

* * * *

ডিসেম্বরের পনেরো তারিখ নাগাদ, অনেক সঙ্কোচ কাটিয়ে, আমি বল্লভবাবুকে অত্যন্ত বিনীত একখানা চিঠি লিখে জানালুম যে তাঁর প্রতিশ্রুতি মতো আর ছ' মাসের ভাড়া যদি এখন পাঠিয়ে দেন তাহ'লে বিশেষ বাধিত হ'বো! ডিসেম্বরের ছু' তারিখের মধ্যেই টাকাটা পাঠাতে সত্যি-সত্যি তাঁর মনে থাকবে, এ অবশ্য আমি আশাও করি নি।

একদিন ছু'দিন ক'রে মাসখানেক কেটে গেলো, চিঠির জবাব এলো না। ভাবলুম, ভদ্রলোক হয়তো কলকাতার বাইরে আছেন, তাছাড়া এই সামান্য টাকার জন্যে বার-বার তাঁকে বিরক্ত করাও লজ্জার ব্যাপার। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে তাঁকে জানালুম যে ছ' মাসের ভাড়া একসঙ্গে দেবার ব্যবস্থা তাঁর আর মনঃপূত না হ'লে মাসে-মাসেই যেন দেন্, এবং ডিসেম্বরের ভাড়াটা সুবিধেমতো পাঠিয়ে দিলে বাধিত হ'বো।

সে-চিঠিরও কোনো জবাব এলো না।

ভয় হ'লো, আমার পৌনঃপুনিক তাগিদে ভদ্রলোক বুঝি বিরক্তই হয়েছেন। এমন চমৎকার লোক, ছ' মাসের ভাড়া

ফেলে রাখলেই বা কী! তবু মার্চ মাসে আর একখানা চিঠি লিখে জানালুম যে এই তিন মাসের ভাড়ার সামান্য অংশও যদি তিনি এখন দয়া ক'রে পাঠান তাহ'লে আমার উপকার হয়। কিন্তু বল্লভবাবু একেবারেই চুপ।

এর পরে আমি আর চিঠি লেখা দরকার কি সঙ্গত মনে করলুম না। ভাবলুন, একেবারে কলকাতায় গিয়েই টাকাটা নেবো।

যে-কাজ নিয়ে হয়দ্রাবাদ এসেছিলুম, এক বছরের আগে ছুটি মিললো না। আবার মে মাসের গোড়ার দিকে ফিরলুম কলকাতায়। দিন দুই বিশ্রাম, তার পর এক সকালবেলায় গেলুম মে-ফেয়ারে বল্লভবাবুর সঙ্গে দেখা করতে।

কিন্তু এ কী! এক বছর বাইরে থেকেই আমার কি কলকাতার পথ-ঘাট গুলিয়ে গেলো, নাকি আমার মাথাই খারাপ হ'লো! আমার বাড়িটাই যে খুঁজে পাচ্ছিনে! বিশ্বাস করো তোমরা, সেই চির পুরোনো রাস্তা দিয়ে যতই হাঁটি, আমার বাড়িটি আর চোখে পড়ে না। রাগ ক'রে গাড়ি ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেলুম বড়ো রাস্তার মোড়ে, দেয়ালের গায়ে আমাদের রাস্তাটির নাম ঠিকই লেখা আছে, তার পর যতটা হাঁটলে আমাদের বাড়িতে এসে পৌঁছনো যেতো, ততটা হেঁটে এসে

দেখি, বাঁ দিকে যেখানে বাড়িটি থাকবার কথা, সেখানে অনেকখানি খালি জমি প'ড়ে আছে, তা-ছাড়া আর এক টুকরো ইঁট পর্যন্ত নেই!

হাঁ হ'য়ে গেলুম। এ কি স্বপ্ন? না আরব্যোপন্যাস?

হঠাৎ বুকের ভিতরটা কেমন ফাঁকা বোধ হ'লো, মনে হ'লো, এক্ষুনি হার্ট-ফেল করবো। পাশেই একটি নতুন বাড়ি উঠেছে দেখলুম, তার একতলার ঘরে এক বুড়ো ভদ্রলোক তামাক খাচ্ছেন আর কাগজ পড়ছেন। আমি সরাসর তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকে একটা চেয়ারে ব'সে পড়লুম।

'কী চাই, মশায়, আপনার?'

'আপনাদের এ-বাড়ি কদ্দিন হয়েছে?'

'এই তো মাসখানেক। কেন, আপনার কোনো দরকার আছে?' ভদ্রলোক একটু সন্দিগ্ধ চোখেই আমার দিকে তাকালেন।

'আচ্ছা, আপনাদের ঠিক পাশে একখানা বাড়ি ছিলো না?'

'ও, হ্যাঁ—দশ নম্বরের কথা বলছেন তো?—সে বাড়ি তো ভাঙা হ'য়ে গেছে!'

'ভাঙা হ'য়ে গেছে? কে ভাঙলো?'

'কে আবার ভাঙবে? যাঁর বাড়ি তিনিই ভেঙেছেন। আপনার এ-সব খোঁজে দরকার কী?'

'এ-বাড়িতে যাঁরা থাকতেন তাঁদের খোঁজ নিতে এসেছিলুম।'

'ও, এসে বুঝি দেখেন, বাড়িই নেই! হাঃ-হাঃ, ভারি মজা তো!'

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা একটু মজারই। তা বল্লভবাবু এখন কোথায় থাকেন জানেন কি?'

'কে?'

'বল্লভবাবুর কথা বলছি।'

'বল্লভবাবু ব'লে তো এখানে কেউ থাকতেন না। সত্যব্রত বাবু থাকতেন। আহা—ভারি অমায়িক, চমৎকার ভদ্রলোক—আর শৌখিনও খুব। তিন পুরুষের বাড়িটা ভেঙে ফেললেন, নতুন ধরনের নতুন বাড়ি করবেন ব'লে। রাবিশগুলোই বিক্রি হ'লো পাঁচ হাজার টাকায়। আমি কিছু কিনেছিলুম, মশাই, আমার বাড়ি তখন উঠছে। আর ফার্নিচারই বা কত! এ-সব সেকেলে জিনিস ওঁর আর ভালো লাগে না, নিলেম ক'রে বেচে দিলেন সব। আসল দাম পঞ্চাশ হাজারের একটি পয়সাও কম হবে না, মশাই, নিলেম ক'রে টেনে-টুনে কুড়ি হাজার পেলেন। আমিও ছু' একটা কিনেছিলুম—ঐ আপনি যে চেয়ারখানায় বসেছেন—'

তাকিয়ে দেখলুম, ঠিকই বটে, চেয়ারটি আমার চেনা। টেলর সাহেবের ড্রয়িংরুমে ঠিক এই চেয়ারটিতেই একাধিকবার বসেছি।

উঠে দাঁড়িয়ে বললুম, 'আচ্ছা, ধন্যবাদ। বল্লভবাবু—মানে সত্যব্রতবাবু এখন কি কলকাতাতেই আছেন?'

'কী যেন, তা তো ঠিক বলতে পারবো না। বলেছিলেন তো কাশ্মীর না উটকামণ্ড কোথায় গিয়ে কিছুদিন বিশ্রাম করবেন, হয়তো গেছেন। বাড়ি ভাঙা-টাঙা হ'য়ে গেছে তো মাস চারেক হবে, এর মধ্যে তাঁকে আর দেখিনি। বড়োমানুষের খেয়াল, বুঝলেন না? সুন্দর বাড়িটি ছিলো—না-হয় একটু সেকেলেই —আরো ছ' চার পুরুষ অনায়াসেই বসবাস করা যেতো। তা তিনি ধাঁ ক'রে ভেঙেই ফেললেন, সবটা ভাঙতেও পুরো একটি মাস লেগেছিলো। পাড়ার লোকেরা বলাবলি করছিলো—বাড়িটা ভাঙবার কী দরকার, ভালো না লাগে নতুন আর-একটা ক'রে নিলেই হয়, পয়সার তো আর অন্ত নেই। তা পয়সা থাকলে সবই মানায়, মশাই, সবই মানায়।'

আমি বললুম, 'যা বলেছেন।'

আর-একটি কথা বললেই এ-গল্প শেষ হয়। বাংলাদেশের ভূগোলে রূপডাঙা ব'লে কোনো জায়গা আজ পর্যন্ত খুঁজে পাইনি।

আমি, নবা, পিণ্টু, আর ভোঁসলা—এই চার জন মিলে একটা কেলাব করেছিলুম। তাসের না, ফুটবলের না, সাইকেলের না, চানাচুর-গরম-চায়েরও না—বই পড়ার কেলাব। দুর্বুদ্ধিটা আমার মগজেই গজায়—আমারই দোষ।

দোষ এই যে বই পড়তে আমি খুব ভালোবাসি। এটা, ভেবে দেখতে গেলে, খুব দোষের কথা নয়, কিন্তু এর ফলে এমন একটি কাজ আমি করতুম বাংলাদেশে যার তুল্য দোষ আর নেই—কিছু-কিছু বই কিনতুমও। বোকারা বই কেনে, আর চালাক লোকরা পরের বই প'ড়ে জীবন কাটায়—এমনকি ধার-করা বই জমিয়ে-জমিয়ে তারা অনেকে ঘর পর্যন্ত সাজায়। এই সরল সত্যটি আমি ঠেকে শিখেছি, তোমরা আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কাজে লাগবে।

এখন হ'লো কী, বই তো কতই পড়তে ইচ্ছে করে, কিন্তু কত আর কেনা যায়! তাই আমি একদিন নবা আর পিণ্টুকে ডেকে ভোঁসলাদের বাড়ির গ্যারেজের পাশে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বললুম—এসো আমরা একটা কেলাব করি।

—বেশ, বেশ! কিসের কেলাব? মহা উৎসাহিত ওরা।

ঠিক এই সময়ে ভোঁসলা এসে বারান্দায় দাঁড়ালো। পরনে

ভোঁসলা এসে বারান্দায় দাঁড়ালো।

ঢিলে রংদার পাৎলুন, আর গায়ে সেই নক্সারই একটা কুর্তা। উসকোখুসকো চুল, চোখ ফোলা-ফোলা, এইমাত্র ঘুম থেকে উঠে এলো। ন'টার আগে কোনোদিন ওর ঘুম ভাঙে না।

আমাদের দেখেই হাঁক দিলে—কী হে, কী জটলা হচ্ছে তোমাদের ?

আমি বললুম—খানসামার মতো পোষাক করেছিস কেন ?

—বাজে বকিসনে। জানিসনে, এটা সায়েবদের শোবার পোষাক। তুই দেখছি একেবারেই বাঙাল !

অত্যন্ত লজ্জিত হলুম। ভোঁসলা বড়োলোকের ছেলে, কত রকম ওর কাপড়চোপড়, ওর এক-একখানা ধুতির দামই নাকি দশ-বারো টাকা ! আর আমি যে হাফ-প্যাণ্টের বয়স পার হ'য়ে ধুতির বয়সে পৌঁছেছি তাতেই আমার বাবা মনে-মনে বেশি খুশি নন।

ভোঁসলা রাস্তায় নেমে এসে এক হাত আমার কাঁধে, আর-এক হাত নবার কাঁধে রেখে বললে—তারপর, কী কথা হচ্ছিলো তোমাদের ?

আমি বললুম—একটা বই পড়ার কেলাব করলে কেমন হয় ?

—ওঃ, ফাইন্ ! ভোঁসলা আমার কাঁধে বেশ জোরেই একটা চাপড় মেরে বসলো। ঠিক এই আইডিয়াটা আমার

মাথায় কিছুদিন ধ'রেই ঘোরাঘুরি করছে। চল্ ঐ হলিউড কাফেতে গিয়ে বসি, চা না-হ'লে কি মাথা খোলে?

বই পড়ার কেলাব শুনে পিণ্টু আর নবার মনটা যেন একটু দ'মে গেলো। পিণ্টু বললে—বই তো আমরা ইস্কুলেই পড়ি, তার আবার কেলাব কী!

ভোঁসলা হো-হো ক'রে হেসে উঠে বললে—ওঃ পিণ্টুটা এখনো একেবারে ছেলেমানুষ আছে!

রাস্তা পার হ'য়ে আমরা হলিউড কাফেতে গিয়ে ঢুকলাম। ভোঁসলা জাঁকিয়ে ব'সে ফরমাস দিলে—চার পেয়ালা চা, চারটে টোস্ট, চারটে অমলেট।

চা খেতে-খেতে কেলাবের প্ল্যান করা হ'লো। আমরা প্রত্যেকে মাসে দু' টাকার বই কিনবো, আর সে-সব বই মেম্বররা সকলেই পড়তে পাবে, কিন্তু মেম্বর যারা নয়, তারা পাবে না। আর সকলের পড়া হ'য়ে গেলে বইগুলো এক জায়গায় জমা থাকবে, যখন যার দরকার তাকেই আবার দেয়া হবে। এইভাবে সকলেরই অনেক বই পড়া হবে, আর আস্তে-আস্তে মেম্বর যদি বাড়ে—

এখানে ভোঁসলা ব'লে উঠলো—ছোঃ! মাসে দু' টাকা মাত্র! দু' টাকায় তো সিলানাপ্পার আধখানা বইও হবে না।

—সিলানাপ্পা কী জিনিস ভাই ? পিণ্টু জিজ্ঞেস করলে।

চা মুখে নিয়ে হাসতে গিয়ে ভোঁসলা দম আটকে ম'রে যায় আরকি! আহা—তখন যদি ভালোমন্দ কিছু হ'য়ে যেতো!

অনেক কষ্টে হাসি থামিয়ে বললে—ইস্, তোরা দেখছি একেবারে আকাট-মূর্খ! সিলানাপ্পার নাম শুনিসনি? মস্ত বড়ো লেখক—এবার নোবেল প্রাইজ পেয়েছে!

নবা বললে—ও-সব বিদঘুটে বই না-ই বা থাকলো। কত সব ভালো-ভালো বই বেরুচ্ছে আজকাল—প্রেমেনবাবুর, শিবরামবাবুর—

ভোঁসলা হঠাৎ গম্ভীর হ'য়ে গিয়ে বললে—তোরা শুধু বাংলা বই কিনবি? তাহ'লে আমি এর মধ্যে নেই।

রাগ ক'রে সে প্রায় উঠে যায় আর কি! আমরা বললুম, আচ্ছা, কিছু ইংরেজি বইও রাখা যাবে, কিন্তু ও-সব শিলিনপাপা-টাপা নয়। বেশ মজার-মজার গল্পের বই—ভূতের গল্প, জাহাজ-ডুবির গল্প—ও-রকম তো অনেক বই আছে ইংরেজিতে।

—কিন্তু আনাতোল ফ্রাঁসের কমপ্লীট সেট্ রাখতেই হবে, নয়তো আমি তোদের মেম্বরই থাকবো না।

আমি বললুম—আচ্ছা, আচ্ছা! ভয়ে-ভয়ে আর-কিছু বললুম না। মুহূর্তে ভক্তিতে, শ্রদ্ধায় মনটা হাবুডুবু খেতে লাগলো। বাসরে—ভোঁসলা তো আমাদেরই বয়েসি, অথচ পড়েছে কত! আমরা নেহাৎই মুখ্যু।

—হ্যাঁ, যা বলছিলুম। মাসে দু' টাকা চাঁদায় কিছুই হবে না, অন্তত পাঁচ টাকা কর্।

পিণ্টু ব'লে উঠলো—ওরে বাপরে, অত টাকা কোথায় পাবো।

নবা বললে—তুই দশ টাকা ক'রে দে না, তবেই তো হ'য়ে যায়। তোর বাপ তো সবজজ্।

ভোঁসলা গম্ভীর হ'য়ে বললে—সামনের মাসেই আমার দু'শো টাকার বই আসছে বিলেত থেকে। পিরানদেল্লোর বই কত খুঁজলুম, এ-দেশে কোথাও পেলুম না।

—ও-সব বই আমাদের কেলাবে দিয়ে দে না।

—তা তো দেবোই। আরো ঢের দেবো, দেখিস। আমার জন্যে ভাবিসনে, তোরা ঠিক থাকিস। প্রথম মাসটায় অন্তত পাঁচ টাকা ক'রে দে।

ভোঁসলা যেখানে এক সঙ্গেই দু'শো টাকার বই দিচ্ছে, সেখানে আমার না বলতে ভারি লজ্জা করলো। কিন্তু নবাটা

কিছুতেই রাজি হয় না। বলে, ভোঁসলার বাপ বড়োলোক, ও সবই পারে। আমি কোত্থেকে দেবো! পিন্টুও সঙ্গে-সঙ্গে পোঁ ধরলো।

যা-ই হোক্, অনেক বকাবকি ঝকাঝকি ক'রে ওদের তো রাজি করানো গেলো। ততক্ষণে চা খাওয়া শেষ হ'য়ে গিয়েছিলো, ভোঁসলা হাই তুলতে-তুলতে উঠে দাঁড়িয়ে আমার পিঠে একটা টোকা দিয়ে বললে—দামটা দিয়ে দে। ব'লেই একেবারে রাস্তায়।

বলতে লজ্জা করলো, কিন্তু আমি ভেবেছিলুম ভোঁসলাই দামটা দেবে। মা একটা টাকা দিয়েছিলেন কাপড়-কাচা সাবান কিনতে, ভাগ্যিস সেটা পকেটে ছিলো!

তারপর?

তারপর সত্যি-সত্যি আমি একদিন পাঁচ টাকা দিয়ে চারখানা বই কিনে নিয়ে এলুম। টাকা কোথায় পেলুম তা আর না-ই শুনলে।

ভোঁসলা এসে বইগুলো নেড়ে-চেড়ে দেখলো। নাক শিঁট-কিয়ে বললে—কী সব বাজে বই এনেছিস! নিয়ে যাই এগুলো। দুপুরবেলা প'ড়ে দেখবো।

আমি বললুম—আমি এখনো—

—আরে তুই তো পড়বিই, তোরই তো বই। আর যা-সব বই, ছুঁতেও ঘেন্না করে আমার! মুখে ও-কথা বললে বটে, কিন্তু দিব্যি হাতে ক'রে নিয়ে চ'লে গেলো।

বিকেলে পিণ্টু আর নবা আসতেই বললুম—কী রে, বই কিনেছিস?

নবা বললে—কিনেছি। ভোঁসলা এসে তো বই নিয়ে গেছে। তোকে দেখায়নি?

পিণ্টু ব'লে উঠলো—সে কী! তোর কাছ থেকেও নিয়েছে! আমাকে বললে ওর বাড়িতেই সব বই থাকবে, তাই—

ও, তাই! ভোঁসলার উৎসাহে মনটা বেশ খুশি হ'য়ে উঠলো। আমাদের চার জনের মধ্যে ওর বাড়িই সব চেয়ে বড়ো, বাড়িতে আসবাবপত্রও সব চেয়ে বেশি; ওর বাড়িতেই বইগুলো যত্নে থাকবে। সেইজন্যেই নিয়ে গেছে।

বললুম—চল একবার ভোঁসলার বাড়ি, দেখে আসি বইগুলো।

গিয়ে দেখি, যা ভেবেছি! একতলার যে-ঘরে ভোঁসলা থাকে, সেখানে একটি ঝকঝকে কাচের আলমারিতে আমাদের তিনজনের বইগুলো সাজানো। আহা—তকতকে নতুন বইগুলো কী সুন্দর দেখাচ্ছিলো! ভোঁসলাকে জড়িয়ে ধ'রে বললুম—ভোঁসলা, তুই-ই গ্রেট!

ভোঁসলা, তু-ই গ্রেট !

ঘুমের আগের গল্প

ভোঁসলা মৃদুমধুর হেসে বললে—আমার এই ঘরটাকেই আমাদের ক্লব ক'রে দেবো! আমিই হ'বো ক্লবের সেক্রেটারি—বইয়ের ক্যাটলগ করবো, যখন যে বই দরকার, চেয়ে পাঠালে তক্ষুনি পাবি। আর এখানে ব'সে তো সব সময়েই পড়তে পাবি।

আমি, পিণ্টু আর নবা একসঙ্গে ব'লে উঠলুম—বাঃ, চমৎকার হ'লো!

ভোঁসলা বলতে লাগলো—আমাদের ক্লাবের নাম হবে রীডর্স ক্লব। একটা রবর-স্ট্যাম্প করাতে দিতে হবে। আর খানকয়েক ইজি-চেয়ার। আরাম ক'রে না-বসলে কি আর পড়া হয়!

পিণ্টু বললে—হ্যাঁ, সে বেশ হবে। ইজি-চেয়ারে আরাম ক'রে হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে—

ভোঁসলা ওর কথার মাঝখানেই ব'লে উঠলো—পাশেই একটা ছোটো ঘর আছে, সেখানে আমরা চায়ের ব্যবস্থাও রাখবো।

—ওঃ, চমৎকার! চমৎকার! নবাটা ফুর্তির চোটে লাফাতে লাগলো।

কেলাবে আরো কী-কী করা হবে তা নিয়ে আরো অনেকক্ষণ গুলজার গল্প হ'লো। চ'লে আসবার সময় আমি বললুম—আমার বইগুলো তাহ'লে এখন নিয়ে যাই।

বই ধার দিয়ো না

ভোঁসলা বললে—এত ব্যস্ত কেন? তোর বই তো আর আমি খেয়ে ফেলবো না। দাঁড়া, আগে রবর-স্ট্যাম্পের ছাপ দিয়ে নিই।

পরের দিন ভোঁসলা এসে বললে—ছাখ ভাই, আলমারিটা বড্ড ফাঁকা-ফাকা দেখাচ্ছে, মোটে ও-ক'খানা বই! যদ্দিন আমার বইগুলো না আসে, তোরা আরো কিছু বই দে, সাজিয়ে রাখি। তুই তো বইয়ের যত্ন জানিসনে, আমার কাছে ভালোও থাকবে।

আমি বললুম—কী-ই বা বই আছে আমার! এই তো ছাখ, মোটে এক আলমারি।

ভোঁসলা আলমারি ঘেঁটে-ঘেঁটে খান কুড়ি বই বার করলে। 'পৃথিবীর সেরা গল্প', 'ছোটোদের মহাভারত', রবিঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছ', জগদানন্দ রায়ের 'গ্রহ-নক্ষত্র'—এমনি সব বই। এ ছাড়া আলমারিতে একটা ইংরিজি বই ছিলো, মোটা-মোটা চার ভল্যুম, অনেক ছবিওলা, জীবজন্তু সম্বন্ধে। ভোঁসলা বললে—বাঃ, এ-বইটা তো বেশ!

আমি তাড়াতাড়ি বললুম—ও-বইটা কিন্তু নিসনে, বাবা জানতে পেলে রাগ করবেন। অনেক দাম বইটার—তিনি শখ ক'রে কিনেছিলেন।

ভোঁসলা ঠোঁট উলটিয়ে বললে—কত দাম ?

—শ'খানেক টাকা।

—ওঃ, মোটে ? আমি ভেবেছিলুম না জানি কী ! এটাও নিয়ে যাই, বেশ মানাবে আমার আলমারিতে। বই তো তোরই রইলো—তোর ভাবনা কী ? যক্ষুনি দরকার চেয়ে পাঠাবি।··· তোদের চাকরকে বল তো বইগুলো পৌঁছিয়ে দিয়ে আসুক।

আমার কথা শুনলে না, অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে পশুপাখির বইটাও নিয়ে গেলো। আমাদের চাকরই পৌঁছিয়ে দিয়ে এলো।

তারপর ?

তারপর এখন কপাল চাপড়াচ্ছি।

তিন মাস হ'য়ে গেলো, ভোঁসলার পাত্তাই নেই। ওর বাড়িতে কম-সে-কম পঞ্চাশবার গিয়েছি, নিচের সেই ঘর তালা বন্ধ, দিনের বেলায় চাকররা বলে বাড়ি নেই, সকালবেলায় বলে তেতলার ঘরে ঘুমুচ্ছে, রাত্তির ন'টার পরে হ'লেও তা-ই বলে। চিঠি লিখে অনেকগুলো ডাক-টিকিট খরচ করলাম, কোনো জবাব নেই। এদিকে বাবা রোজই শাসান, সেই জানোয়ারের বইটা পাওয়া না-গেলে আমার পিঠের চামড়া আস্ত রাখবেন না। আর পিন্টু আর নবার টিটকিরির জ্বালায় প্রায় পাগল হবার জোগাড়। পিন্টু বলে, ধরমতলার মোড়ে এক পুরোনো বইয়ের দোকানে ও

নাকি বাবার সেই চার ভল্যুম বই দেখে এসেছে। নবা বলে, আমার নাম লেখা কয়েকটা বই ও ক্লাশের এক ছেলের কাছে দেখেছে—সে নাকি ফুটপাথ থেকে এক টাকায় ছ'খানা বই কিনেছে। ওদের কথা শুনে গুম্ হ'য়ে থাকি, আর আমার ফাঁক-করা আলমারির দিকে তাকিয়ে আমার মন থেকে-থেকে হু-হু ক'রে ওঠে।

তোমাদের সকলকেই ব'লে রাখি—কাউকেই বই ধার দিয়ো না। মনের ভুলে অন্য কাউকে যদি বা দাও, ভোঁসলাকে কক্ষনো দিয়ো না। ভোঁসলা দেখতে কেমন, তাও তোমাদের ব'লে দিচ্ছি। রং ফর্সা, চোখ কটা, কোঁকড়া ব্যাক্-ব্রাশ-করা খাটো চুল, গোলগাল মুখ, বেঁটে, বেশ মোটা-সোটা। চেহারা ও চালচলন দেখলে বাচ্চা নবাব মনে হয়। কথাবার্তা শুনলে মনে হয় হাজার টাকার নোট দিয়ে ও ঘুড়ি ওড়ায়। আর যা-ই করো, এই ভোঁসলাকে কক্ষনো বই ধার দিয়ো না—সাবধান!

শেষ